বীর সৈনিক বাঘা যতীন

৪৭৩

মানি বাগচি

মানি বাগচি

Mss - In the Press

ছোটদের
বইয়ের
স্বপ্নরাজ্য

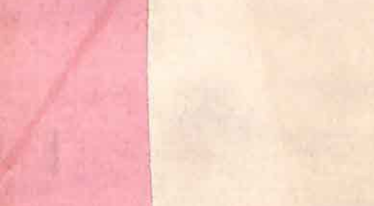

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের নতুন ঠিকানা
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

ACC NO - 15098

৪'৮

৪৭৬

সংখ্যা ১

Birth Centenary. December.

বীর সৈনিক

[illegible]

ও

বাঘা যতীন

২য় প্রকাশ

ইন্দ্রনাথ মজুমদার
কলিকাতা

খণ্ড ৮

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

রাসবিহারী বসু

ও

মানবেন্দ্রনাথ রায়

এই বিপ্লবী ত্রয়ীর স্মৃতিতে নিবেদিত।

মরণ-সাগর পারে

তোমরা অমর

তোমাদের স্মরি।

তখন সমস্ত দেশের ওপর পড়েছিল দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া। এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশেই ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। তারপর একটি শতাব্দী শেষ হয়ে শুরু হলো একটি নতুন শতাব্দী — বিংশ শতাব্দী। ১৯০০ থেকে ১৯০৫ — এই কয় বছর ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এরমধ্যে ১৯০৫ সালটা সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলার ইতিহাসে।

১৯০৩, ডিসেম্বর।

লর্ড কার্জনের হাত থেকে নেমে এলো বঙ্গচ্ছেদের খড়্গাঘাত।

বাংলার শিয়রে যেন অকস্মাৎ বজ্র পড়ল।

শাসন ব্যবস্থার সুবিধার অজুহাতে বাংলা দেশকে দ্বিধা খণ্ডিত করবার প্রস্তাব প্রকাশিত হলো সরকারী ভাবেই ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর। বাংলা বলতে তখন বুঝাত একটি বিরাট দেশ — বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলা। নবাবী আমলে একেই বলা হতো সুবা বাংলা। কলকাতা ছিল তখন ভারতের রাজধানী। বাংলা দু'ভাগ হবে — এই সংবাদে চারদিকে বিক্ষোভ দেখা দিল। বিক্ষোভ থেকে প্রতিবাদ। বাংলার শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদ জানাল। কলকাতা এবং সমস্ত বাংলার জেলায় জেলায় প্রতিবাদ সভার আয়োজন হতে লাগল।

কিন্তু লর্ড কার্জন প্রতিবাদ শুনবার মতো লোক ছিলেন না। প্রতিবাদ নিষ্ফল হলো। ১৯০৫, ২০ জুলাই বিলাত থেকে সংবাদ এলো যে ভারত-সচিব বঙ্গবিভাগ মঞ্জুর করেছেন। প্রতিবাদ আন্দোলন তখন

কেমন

১ প্রায় এক লক্ষ বাঙালির স্বাক্ষরিত একটি স্মারকপত্র বিলাতে ভারতসচিবের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেটাও নিষ্ফল হলো। ১৯০৫, ২০ জুলাই বিলাত থেকে সংবাদ এলো, পার্লামেন্ট কার্জনের প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন। কার্জনের এই আঘাতের ফলে জেগে উঠলো বাংলা — জেগে উঠলো আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ।

জাতির এই বেদনাকে ভাষা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখলেন: 'আমরা প্রশ্রয় চাহি না; প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ।' 'সঞ্জীবনী', 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রিকায় সংস্কৃতির পরিণামে স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতি বর্জনের সুর উঠলো উচ্চগ্রামে। বিদেশী দ্রব্য আর ব্যবহার করবে না — এই প্রতিজ্ঞা বাঙালি গ্রহণ করলো।

১৯০৫, ৭ আগস্ট।

বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে একটি বিরাট জনসভা হলো। সেদিন বিরাট জনসমাবেশ; এমন অকল্পিত জনসমাবেশ হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত এক সঙ্গে তিনটি সভা করতে হয়েছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন এমনি করেই জাগে। এই সভাতেই জাতির মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বজ্রকণ্ঠে শোনা গিয়েছিল সেই দৃপ্ত উক্তি: 'I will unsettle the settled fact' — আমি এ বিধান রদ করবই'। এ শুধু তাঁর মুখের কথা ছিল না, এ ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটি জাতির অন্তরের কথাই

স্মরণীয় সভাতেই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারিত হয়েছিল। সেদিন হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত শপথ ছিল এই : 'যদি বঙ্গ-ভঙ্গ আইনে গৃহীত হয়, তাহলে বাঙালি বিলাতি কাপড়, বিলাতি জিনিস বর্জন করবে।' বিলাতি বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ – এই প্রতিজ্ঞায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল বাঙালির হৃদয়।

তখন বিলাতের ম্যানচেস্টার থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় আসত। তাতে শাসক জাতির বড়ো কম লাভ হতো না। বাঙালির এই শপথ গ্রহণের ফলে তাদের ভাতে হাত পড়বার উপক্রম হলো। বিলাতি জিনিস বর্জন করার শপথ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির চেতনায় শুরু হয় এক বিরাট আলোড়ন। সকলের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো এক অদ্ভুত প্রাণচঞ্চলতা। উনিশ শো পাঁচের সকাল বেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠে বাঙালি যেন নতুন করে শুনতে পেলো, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সেই প্রাণবাণী : 'তোমার দেশ মায়ে তোমার বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা – সে তোমার জন্মভূমি।'

আর মনে পড়লো ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। যে দেবী মূর্তির বিগ্রহ তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন তিনি, উনিশ শো পাঁচে বাঙালি চেয়ে দেখলো বিশ্বজননী আর দেশজননীরূপে তার সমস্ত অন্তর আলো করে রয়েছেন। আর উনিশশো পাঁচের সেই মুহূর্তে বাঙালির কাছে এলো এক নতুন চেতনা মন্ত্র– যে মন্ত্র এতদিন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের মধ্যে। তাঁর নবোদয় আলোকে হঠাৎ সেই মন্ত্র হয়ে উঠলো প্রাণময়। সেই মহামন্ত্র এলো মুখ থেকে প্রাণে। বাঙালির

কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো মাতৃপূজার মাঙ্গলিক মন্ত্র: বন্দে মাতরম্!

আর সেদিন পরম আশ্বাসের বাণী নিয়ে বাঙালির সামনে এসে দাঁড়ালেন জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কণ্ঠে ঝংকৃত হলো জাগরণের এক নতুন মাঙ্গলিক। রাতের অন্ধকারে নেতারা যখন সমবেত হয়ে বিলাতি জিনিস বর্জনের শপথ গ্রহণ করছিলেন তখন কবির কাছ থেকে এলো ঐক্যবদ্ধ হবার এক অভিনব প্রেরণা, এক উৎসাহের সংগীত:

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

#-space #

১৯০৫। ৩১ আগস্ট। বাংলা আশ্বিন মাস।

উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় আশ্বিনের রাত জেগে কাটিয়েছে সকলেই। তাদের আশা ছিল, হয়ত শেষ মুহূর্তে বড়লাটের মনে জাগতে পারে শুভবুদ্ধি, ক্ষুব্ধ জনমতকে হয়ত তিনি অস্বীকার করবেন না, হয়ত বাংলা ভাগ না-ও হতে পারে। কিন্তু না, ১৬ আশ্বিনের সকালবেলায় ক্ষীণ আশাটুকুও আর রইল না। ১৯০৫, সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনটিতেই সিমলা শৈলশিখর থেকে গভর্নমেন্ট সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন বঙ্গ-বিভাগ। প্রভাতী সংবাদপত্রে সকলে জানতে পারলো সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ। কে যেন বাঙালির হৃদয়ে শেলের আঘাত করলো। ভারতের মানচিত্রে এক বাংলা — পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলা রূপে দেখা দিল। এক বাঙালি, কার্জনের কলমের এক খোঁচায় দুই ভাগে আলাদা হয়ে গেল। কার্জন পরিকল্পিত Partition of Bengal বা বঙ্গব্যবচ্ছেদ এখন রীতিমতো বাস্তব রূপ নিতে চললো। আইন পাশ হয়ে গিয়েছে; অতএব বাঙালিকে মেনে নিতে হবে স্বৈরাচারী ওই বিধান।

এইবার ইতিহাসের অনিবার্য গতিমুখে জ্বলে উঠলো শিখা জ্বেলে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো স্বদেশী আন্দোলন। বাঙালির জীবনে এলো নতুন প্রভাত; আর সেই নতুন প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়লো সারা ভারতে। ২ সেপ্টেম্বরকে বাঙালি গ্রহণ করলো একটি অশৌচের দিন হিসাবে — জাতীয় শোক প্রকাশের দিন হিসাবে। প্রভাত সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল শহরতলীর রাস্তা দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে খালি

যাচ্ছে গঙ্গার দিকে। সে-দৃশ্য ভুলবার নয়। সেই উদ্বেলিত জনতার পুরোভাগে দেখা গেল নব জাগরণের পুরোহিত রবীন্দ্রনাথকে। তিনিও নগ্নপদে চলেছেন জনতার সঙ্গে। নেতারাও সবাই আছেন। সকলে প্রথমেই গঙ্গায় স্নান করলেন। ভারত-ভাগ্যবাহিনী গঙ্গার পবিত্র বারি অঞ্জলিপুটে ধারণ করে সবাই বলতে থাকেন:

'বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।'

গঙ্গায় স্নান করে বাঙালি প্রতিজ্ঞা করে:

'বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।'

স্তব্ধ-মন বিদেশী বর্বরের দল। আর সেই সঙ্গে গঙ্গার দুই তীর কাঁপিয়ে হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠে — বন্দে মাতরম্।

ঐ দিন — ঐ চিরস্মরণীয় দিনে বেদনার প্রতিঘাতে মিলনের রাখীসূত্র হাতে বেঁধে শপথ নিলো বাঙালি:

'ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই।'

আর সঙ্গে সঙ্গে কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো

'এক জাতি এক প্রাণ, এক দেশ এক সংকল্প।'

হলুদ রঙের রাখী হাতে বেঁধে আর কণ্ঠে এই মন্ত্র নিয়ে সকলে মহানগরীর পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। রাখি প্রতিজ্ঞের সেই নব সংকল্পের ঢেউ শহর ছাড়িয়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে আছড়ে পড়ে। পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র চলে রাখীবন্ধনের উৎসব। হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সকলে বলে: 'এক জাতি, এক প্রাণ, এক ভাবনা।'

এরপর ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর আরো দুটি সভা হলো বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদে। শেষের সভাটি হয়েছিল কলকাতার ময়দানে। এখানে সমবেত হয়েছিল জনসাধারণ আর স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। বিক্ষোভের প্রবল আওয়াজ উঠলো তাদের কণ্ঠে। তারা সকলেই ছিল নিরস্ত্র। কিন্তু সেই জনতার উপর পুলিশের লাঠি নেমে এলো অতর্কিতে। সরকারী দমন-নীতির সেই প্রথম প্রকাশ।

বাংলা দু'টুকরো হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির অন্তরের বেদনা মূর্তি পেলো একটি মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্পের মধ্যে। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর মিলন-মন্দিরের ('ফেডারেশন হল') শিলান্যাস করলেন বর্ষীয়ান জননেতা আনন্দমোহন বসু। রোগ শয্যাশায়ী হয়ে এসেছিলেন একটি চেয়ারে বাহিত হয়ে। সমস্ত জনতাকে অভিভূত করে তিনি বললেন: 'এই যে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হলো, আজ থেকে এই-ই আমাদের সংকল্প।' এই সভাতেই [illegible] পত্র থেকে জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন: 'আমরা প্রতিজ্ঞা করছি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করতে এবং বাঙালি জাতির ঐক্য রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের শক্তিতে যা কিছু সম্ভব তার সবই প্রয়োগ করব।'

এইভাবে ভেঙে বাংলার মনের আকাশ রাঙিয়ে ফেলে মিলনের নতুন সূর্য। সেই সূর্যের দীপ্ত কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সকলের মুখ। বাংলা শুধু একলাই জাগল না। জেগে উঠে যে ডাক দিলো ভারতের অন্য সব প্রদেশকে, অন্য সব প্রদেশের লোকেদের। কোলাহলের শঙ্খধ্বনিতে সকলকে ডাক দিলো বেহারীকে - মারাঠীকে - পাঞ্জাবীকে - মাদ্রাজীকে - ভারতের যে যেখানে ছিল, সবাইকে।

দেখতে দেখতে ঘটনার স্রোত দ্রুত আবর্তিত হয়ে চললো।

নব-জাগরণের প্রাণ-সঞ্জীবনী বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে তুললো। ভরে উঠলো কবি-শিল্পীর হৃদয়। গানে ও বক্তৃতায় দেশের মানুষের চিত্তে প্রকাশিত হলো নতুন উদ্দীপনা। একদিকে রবীন্দ্রনাথের অন্তরীক্ষ থেকে ওঠে গানের পর গান-স্বদেশী গান। মিছিলে মিটিঙে শৃঙ্খল অন্তরে অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ বাংলার দেশপ্রেমিক নেতাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মাতৃবন্দনা। স্কুল-কলেজ থেকে দলে দলে বেরিয়ে এলো ছাত্ররা। তারা ছুটলো স্বদেশীর কথা, অর্থাৎ, বিলাতি জিনিস বর্জনের শপথের কথা সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় একটি মন্ত্র—বন্দে মাতরম্।

এমনি করেই সেদিন, সেই স্মরণীয় উনিশশো পাঁচে বাংলার বুকে নেমে এলো দুর্দিন। সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ হয় 'বন্দে মাতরম্'। কিন্তু নিষেধ মানল কে? সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম গর্জনের মতো সারা দেশের বুকের ভেতর থেকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—বন্দে মাতরম্। স্বদেশী আন্দোলনের মশাল হাতে নিয়ে কলকাতা থেকে দেশনায়কেরা বেরিয়ে পড়লেন

বাংলার সর্বত্র জাগরণের শুভ সমাচার প্রচারের জন্য — বিশেষ করে তাঁরা গেলেন পূর্ব বাংলায়। এইভাবে বহু ঘটনা প্রবাহ উত্তেজনা ও আবেগের মধ্যে একটি বছরের অবসান ঘটলো। এইবার আমরা প্রত্যক্ষ করলে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতি বদলালো। এই বছরের শেষ ভাগে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল কাশীতে। সভাপতি — গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। তিনি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে বাংলার স্বদেশীর দাবীকে ন্যায্য দাবী বলে ঘোষণা করলেন। এই বছরেই সাত বছর প্রভুত্ব চালিয়ে বিদায় নিলেন লর্ড কার্জন।

space

স্বদেশী আন্দোলনের দুঃসাহসিক স্তর অতিক্রম করে এইবার আমরা উপনীত হব দ্বিতীয় স্তরে — প্রজ্বলিত হুতাশন স্তরে। এই পর্বেই বাংলার সেই আন্দোলন হয়ে উঠেছিল জমজমাট — সর্বাত্মক। এই পর্বে আমরা দেখব বরোদা রাজ কলেজের অধ্যাপনার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাংলায় এলেন বিপ্লবের রণগুরু অরবিন্দ ঘোষ — যিনি দেশ-বিদেশে শ্রী অরবিন্দ নামে সম্মানিত।

শুরু হলো ইংরেজি নববর্ষ ১৯০৬ সাল। ইতিমধ্যে বাংলার প্রাণপ্রবাহ যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ভীম গর্জনে বয়ে চলেছে সেই উত্তাল প্রবাহ। নতুন ইতিহাস রচনা করবে বাঙালি এই ইংরেজি নতুন বছরে। ঘটনা-স্রোত যেন জল-তরঙ্গের মতো ক্ষিপ্রবেগে আবর্তিত হবে

এইবার। আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি এবার একটা নতুন মোড় নিলো। এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল অরবিন্দের একটি বক্তব্যের মধ্যে: 'We want absolute autonomy free from British control' — অর্থাৎ, "ইংরেজ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে আমরা চাই সার্বভৌম স্বাধীনতা।" এর ঠিক দশ বছর আগে মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলকের কণ্ঠে ভারতবাসী শুনেছিল: 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার।' বস্তুত উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই স্বাধীনতার চিন্তাটা ভারতবাসীর মনে জাগতে শুরু করেছিল। সেই চিন্তারই বিস্ফোরণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম উনিশশো ছয় সালের প্রথম দশকেই। আমাদের এই আলোচনার নায়ক যতীন্দ্রনাথের বয়স তখন ছিল চব্বিশ বছর। স্বদেশী আন্দোলনের আগ্নেয় উত্তাপ সেই তরুণের মনকে কিভাবে স্পর্শ করে, তাঁকে দেশসেবার অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব। এখন আমরা স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের মোটামুটি আলোচনা করি।

১৯০৫ থেকে ১৯০৯ — হিসাব মতো এই পাঁচ বছর চলেছিল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রথম ভেরী নিনাদ শোনা গিয়েছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায়; তারপর আসর মাতিয়ে দেখা দিল প্রকাশিত হতে থাকে বিপ্লববাদী দলের অন্যান্য মুখপত্র, যথা- 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', আর ইংরেজি 'বন্দেমাতরম'। প্রত্যেকটি কাগজে থাকত বিপ্লবের

অগ্নিঝরা বাণী যা অনিবার্যভাবে দেশের যুবচিত্তকে উদ্‌বোধিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিল। বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক মুখপত্র ছিল 'যুগান্তর'। এর আবির্ভাব ছিল যেমন আকস্মিক তেমন অভূতপূর্ব। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক। 'বন্দে মাতরম' কাগজ প্রথমে শুরু করেন বিপিনচন্দ্র পাল, পরে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও অরবিন্দ ঘোষ। এই লেখকদের শক্তিশালী রচনা ও চিন্তার মৌলিকতা সকলকে বিস্মিত করলো, আর উদ্বিগ্ন করে তুললো শাসক সম্প্রদায়কে।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে অরবিন্দ বাংলায় এলেন ১৯০৬ সালে। সরকারী স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তখন গঠিত হয়েছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; এঁর 'ডন সোসাইটি' (Dawn Society) ছিল পরিষদ তথা ন্যাশনাল কলেজের মুখ্য প্রেরণা। বরোদার রাজ কলেজের হাজার টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে মাত্র দেড়শত টাকা মাইনেতে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ। সেযুগে তাঁর মতো কৃতবিদ্য বাঙালি দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না বললেই হয়।

কিন্তু কলেজের সঙ্গে তিনি বেশিদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। অবিলম্বে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার মাধ্যমে নতুন রাজনৈতিক চিন্তা প্রচার করতে থাকেন। একটি সংখ্যায় সম্পাদকীয়

নিবন্ধে তিনি লিখলেন : 'আর উত্তেজনার আগুন পোয়ানো নয়। আবেদন-নিবেদনও নয়। গলাবাজিও নয়। ওসব অনেক হয়েছে। এখন কাজের সময়। লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হয়ে, জাতিকে সংগ্রাম করে নামতে হবে।' বাংলার জাতীয়তাবাদী দল তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করে নিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌত্রিশ বছর।

১৯০৬, ১৪ এপ্রিল।

বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন বসল। এক বাংলা ভেঙে তখন দুই বাংলা হয়েছে। পূর্ব বাংলার নতুন লাট ব্যামফিল্ড ফুলার আর পশ্চিমবঙ্গের লাট এন্ড্রু ফ্রেজার। ফুলারী শাসনে 'বন্দেমাতরম' নিষিদ্ধ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন বরিশালের সর্বজনমান্য নেতা। তিনিই ছিলেন কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বাংলার স্বদেশসেবক শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ — সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, কৃষ্ণকুমার, শ্যামসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রভৃতি অনেকেই এসেছিলেন।

এই বরিশালের মাটি সেদিন পুলিশের লাঠির আঘাতে রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল আর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বাংলার মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ। সেসব কাহিনী আজ ইতিহাস। সেদিন কাব্যশিল্পীদের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়েছিল:

'আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল লাঠির ঘায়
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায়।'

১৯০৬, জুন মাস। বাংলার চরমপন্থী স্বদেশী মণ্ডলীর উদ্যোগে মহানগরীতে শিবাজী-উৎসব ও ভবানী পূজার আয়োজন করা হয়। তাদেরই নিমন্ত্রণে মহারাষ্ট্র-কেশরী বালগঙ্গাধর তিলক কলকাতায় এলেন উৎসবে যোগদান করতে। ৪ জুন থেকে ১২ জুন - এক সপ্তাহকালব্যাপী এই অনুষ্ঠান সেদিন কলকাতার বুকে তুমুল প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিল। পার্কের মাঠে ৫ জুনের বিকেলে সভায় বক্তৃতা দিলেন তিলক; বললেন - 'যদি ভবানীকে চাই, তাঁর পূজারও চাই।' অরবিন্দ ঘোষ এমনি কথা বাংলায় আসবার আগে বলেছিলেন এবং তাঁর অনুজ বারীন্দ্রনাথের মাধ্যমে বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের জন্য একটি পুস্তিকা রচনা করে পাঠিয়েছিলেন। যেটির নাম ছিল 'ভবানী মন্দির'। বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীদের কাছে এই পুস্তিকাটি সেদিন বাইবেল-স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। তারা সকলে ভবানী মন্দিরের নির্ভীক পূজারী হতে চেয়েছিল। এদেরই মধ্যে বাঘা যতীন ছিলেন একজন।

॥ দুই ॥

অনুশীলন সমিতির ইতিহাসটা একটু বলা দরকার। শক্তিচর্চার জোয়ার এনেছিল এই অনুশীলন সমিতি। এর প্রথম যুগের সভ্যতালিকার মধ্যে বাঘা যতীনের নাম আছে। বঙ্গ-ভঙ্গ তথা স্বদেশী আন্দোলনের অনেক আগে এই সমিতির উদ্ভব আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এবং অগ্নিযুগের বাংলার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। বাঙালী তরুণকে শক্তিচর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৯০২ সালের ২০ মার্চ কলকাতায় হেদুয়ার কাছে মদন মিত্র লেনে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়।[১] জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এই সমিতির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে সমন্বিত আদর্শ মানব জীবনের যে নির্দেশ আছে—তাহাই হইল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু, কিন্তু ব্যারিস্টার পি মিত্র ছিলেন এর প্রাণস্বরূপ।

বাঙালি যুবকদের শক্তিচর্চায় উদ্বুদ্ধ করার কৃতিত্ব ছিল অনুশীলন সমিতির। শরীরচর্চা তখন বাঙালি বিস্মৃত হয়েছিল। এই সমিতির উদ্ভবের পর থেকে এদেশে শক্তিচর্চার যেন বান ডেকে গিয়েছিল। সমিতির ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, 'অনুশীলন সমিতি সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহার উচ্চ আদর্শ যুবক সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহারা দলে দলে সভ্য

১. এর সম্পূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে শ্রীজীবনতারা হালদার প্রণীত 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' নামক বইতে।

হইতে লাগিলেন। দেশের নেতৃবৃন্দও ইহার কার্যকলাপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বহু অন্যান্য ব্যক্তি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় সুললিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া, সভ্যদিগকে উৎসাহিত করিতেন, ভগিনী নিবেদিতা নিয়মিত তাঁহাদের উপদেশ দিতেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও জাতীয় উত্থানে অনুশীলন সমিতির অবদান বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ মানুষ তৈরি করা। শারীরিক উন্নতির জন্য সবদিকে যেমন নানাপ্রকার ব্যায়াম — ডন, বৈঠক, কুস্তী ইত্যাদি চলত, তেমনি হা-ডু-ডু প্রভৃতি দেশীয় খেলাও চলত। ক্রমে লাঠি খেলা, মুগুর ভাঁজা, অসিখেলা, ছোরা খেলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ঘোড়ায় চড়া, রিভলভার ও বন্দুক চালানোও শিক্ষা দেওয়া হতো। এমনি সমিতির উদ্যোগে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আখড়া স্থাপিত হয়েছিল। এই ভাবে মহানগরীকে, তথা পশ্চিমবঙ্গে, অনুশীলন সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ববঙ্গে ঢাকা শহরে এর একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানে এর প্রধান পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস। তাঁরই অসাধারণ কর্মপ্রচেষ্টা ও সংগঠন শক্তির ফলে সমস্ত পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতি প্রচুর প্রসারিত হয়েছিল। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে পাটনা, কাশী, দিল্লী, গৌহাটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশেও অনুশীলন সমিতির শাখা ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে এই সমিতির একটি বিরাট ভূমিকা ছিল।

প্রথম থেকে, উত্তরকালে যেসব বিপ্লবী কর্মী এই সমিতিতে যোগদান করেছিলেন তাঁদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য ছিল নানা রকম জ্ঞানবৃদ্ধির আয়োজন। সমিতির কর্মকর্তারা বিশ্বাস করতেন যে, শুধু শরীরের বল দিয়ে কিছু করা যায়না, সেই সঙ্গে মনের বল-ও দরকার। তাই ভবিষ্যতের তরুণ বিপ্লবীদের মানসিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের জন্য অধ্যয়ন অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছিল। দেশ বিদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী পড়তে সকলকেই উৎসাহিত করা হতো — বিশেষ করে বীরপুরুষদের জীবনচরিত, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার কাহিনী ইত্যাদি। এজন্য সমিতির উদ্যোগে ছাত্রভান্ডার নামে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা এই গ্রন্থাগারে অনেক বই — বেশির ভাগই বৈপ্লবিক সাহিত্য — দান করেন। এইভাবেই সেদিন অনুশীলন সমিতি অগ্নিযুগের বাংলায় বিপ্লবীদের আখড়ার সঙ্গে কর্মীসংগ্রহ কেন্দ্র (Recruiting Centre) পরিণত হয়েছিল।

Space

সেদিনের আগুনঝরা বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বাঘা যতীন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং স্বামীজির মহাপ্রয়াণের কয়েকমাস আগে ভক্তের নিবেদিতার সঙ্গে তিনি বেলুড় মঠে এসেছিলেন স্বামীজির সন্দর্শনে। সে-কাহিনী

আমরা যথাস্থানে বলব। এখন নিবেদিতার কথা বলি। অগ্নিযুগের বাংলায় এই মহীয়সী নারীকে আমরা পেয়েছিলাম যথার্থ বিপ্লবী নায়িকারূপে। ইহলোক থেকে এই শতাব্দীর সূচনায় বিদায় নেবার আগে স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালী তরুণদের মেঘমন্দ্রিত স্বরে যেভাবে ডাক দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরই মানসকন্যার কণ্ঠকে আশ্রয় করে সেই আহ্বান আরো নিবিড়, আরো ব্যাপক হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর জীবনেতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, খুব অল্পকালের মধ্যেই বাংলার উত্তপ্ত রাজনীতির আসরে নেমেছিলেন নিবেদিতা এবং বাঙালির মনে উগ্র স্বাদেশিকতার বীজ বপন করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকেই তাঁর লেখনী ও রসনা জাগরণকে দীপ্যমান করে তুলতে থাকে। তখন থেকেই গুরুর অনুসরণে দেশের চারদিকে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে দেওয়াই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনব্রত। স্বদেশী আন্দোলনের রক্তিম উদয় — জাতীয় জীবনের সেই মহাসন্ধিক্ষণে বাঙালির ভাবজগতে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন যেন মাভৈঃ অভয়রূপে।

বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, জাতীয় জাগরণের সেই কলমন্দ্রিত আসরে নিবেদিতার শিখাময়ী মূর্তি দেখে বাংলার সকল নেতাই মুগ্ধ হলেন, বিস্মিত হলেন, বিশেষ করে অরবিন্দ। বরোদায় প্রথম দেখেছিলেন, এখন কলকাতায় এসে তাঁকে যেন তিনি আরো সত্য করে চিনলেন। অবসন্নতার দীর্ঘ দীর্ঘ মুহূর্তে বিদ্যুতের চাবুক দিয়ে বার বার আঘাত হেনে সাতকোটি বাঙালিকে শিখাময়ী এই নারী কেমন করে এমনই আশায়, এমনই

আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে রাঙিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন – তা যাচ্ছে দেখে অরবিন্দের যেন বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতা।

অঞ্জলির বিপ্লব প্রচেষ্টায় নিবেদিতা।

স্বদেশীযুগের বাংলার ইতিহাসে তিনি একাই যেন একটি অধ্যায়।

বঙ্গভঙ্গের বেদনা বুকে নিয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার ছেলেদের পাশে। কলঙ্কময় জীবনের মহাপঙ্ক থেকে বাঙালি ছেলেদের তিনি ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন অগ্নিকমল রূপে। সেই রুদ্রাণীর কণ্ঠে আমরা যে কথা শুনলাম তা শক্তির কথা, মুক্ত মানুষের কথা, তেজস্বীর বীর্য, উদ্দীপ্ত জীবনের কথা – মৃত অক্ষরের শব্দ নয়, যেন একটি মন্ত্রোচ্চারণ। সাতকোটি বাঙালি যেন বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো, প্রেমের অগ্নিমশাল হাতে এ কোন্ নারী – তুষার ধবল আবরণে অঙ্গ ঢাকা – যেন মূর্তিমতী বীণাপাণি, অগ্নিবীণায় নবযুগ-জীবনের মহামন্ত্র বাজিয়ে বাংলাদেশের দুয়ারে থেকে আবির্ভূতা হলেন। পরনে শুভ্রতার ফকীর, চোখে তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি, ললাটনেত্রে আগুন, হাতে বরাভয়, হাস্যে স্নেহের অমৃত কল্যাণধারা – নিবেদিতা যেন অরবিন্দের সাক্ষাৎ শক্তি। স্বদেশী আন্দোলনের সেই উত্তাল পরিবেশে বাংলার প্রাণ-ভাগীরথী শতধারিত তরঙ্গ-প্রবাহে বেগে উঠেছিল প্লাবন ছন্দে। একা একজন নারী তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে কিভাবে দিকে দিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, আর কেমন

করেই যা তিনি বাংলার সহস্র সহস্র হৃদয়ের প্রার্থনা-ভরা অন্তরে আশার অগ্নিবীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে-ইতিহাস ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

১৯০৫

'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি', 'যুগান্তর' আর 'বন্দেমাতরম্' – দেশজননী তখন চতুর্মুখে সরবে কথা বলে চলেছেন এই কয়খানি কাগজের মাধ্যমে। কংগ্রেসের রাজনীতি পরিবেশিত হতো এইসব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। কিন্তু আসর জমে উঠেছিল যখন সবশেষে বের হলো 'বন্দেমাতরম্'। যুগান্তরের আসরটা ছিল একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। ... তাঁর কলম ছিল ... সাময়িক ... রাজদ্রোহের সুর। সরকার বাজেয়াপ্ত করে ফেললেন। রাজদ্রোহের অপরাধেই ... সাথে আসতো ইংরেজ-বিদ্বেষ।

১৯০৬, কংগ্রেস।

কলকাতায় বসল জাতীয় মহাসভার অধিবেশন। সভাপতি—বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজি। বয়কটের বিরুদ্ধে বাংলার চরমপন্থী জাতীয় দল যে আদর্শ ও উপায় নিয়ে সেদিন দাঁড়িয়েছিল, নরমপন্থী বা মডারেট লোকেরা সাহেবের অধিবেশনে তার কোন স্বীকৃতি শোনা গেল না। জাতীয় দলের নেতারা সবাই ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু ইতিহাসের গতি [প্রবল স্রোতেই] আর কিছুমাত্র সন্দিগ্ধ হলো না — বয়ে চললো। স্বদেশী প্রবর্তন হয়ে গেল নতুন সুর। দেখতে দেখতে বাংলার আন্দোলনে

এলো নতুন প্রাণের জোয়ার। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। সেই যৌবন জলতরঙ্গ শাসকগোষ্ঠীকে ক্রমেই শঙ্কিত করে চলতে থাকে।

কংগ্রেসের লক্ষ্য — ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।
চরমপন্থীদের দাবী — পূর্ণ স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনতা লাভ করবার জন্যই তো বাংলায় তখন সন্ত্রাসবাদী দলের নেতারা এক নিগূঢ় যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। তাঁদেরই অনুপ্রেরণায় সেদিনের তরুণ বাঙালি মেতে উঠেছিল দেহের শক্তি, মনের শক্তি ও চরিত্রের শক্তি — এই তিন রকম শক্তির অনুশীলনে। এঁদেরই — এই নবজাতকদের হাতে সেদিন দীক্ষা তুলে দিয়েছিলেন বারীন্দ্র, অরবিন্দ। জীবন মৃত্যু ওরা পেলো এক আদর্শ শক্তির সন্ধান। তাইতো নির্ভীক চিত্তে স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে মরণ বরণ করতে ওরা ছুটে গিয়েছিল।

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন ছিল সেদিন সামান্যই। কিন্তু তাই দিয়ে হিমালয়প্রমাণ বাধাকে ওরা কেমন করে টলাতে পেরেছিল? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বারীন্দ্র-অরবিন্দ প্রমুখ নেতাদের প্রেরণায় ওরা বুঝেছিল — দেহের শক্তি নির্ভর করে চরিত্রশক্তির ওপর। তাইতো বাংলার শিক্ষিত নবীনদের দল অনুশীলন সমিতির প্রেরণায় অসাধারণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল সেদিন।

১৯০৭ সাল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে নানা ঘটনার জন্য। এই বছরেই দমদম নগরের প্রাসাদে, অরবিন্দের নেতৃত্বে

উৎসাহ ও প্রেরণায় সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম লীগ – ভারতীয় রাজনীতির বিষবৃক্ষ। মুসলিম লীগ জন্ম নেবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কুমিল্লা ও জামালপুরে ঘটেছিল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। এই দাঙ্গা উপলক্ষ্য করে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় বেরুলো কয়েকটি অগ্নিবর্ষী লেখা – সেগুলি ছিল অরবিন্দের লেখনী-প্রসূত। তিনি লিখেছিলেন: 'এই দাঙ্গা থেকে আমরা এই শিক্ষা পেলাম যে, সবরকম দুর্বলতা পরিহার করে হিন্দুদের আত্মশক্তিমান হতে হবে।' এইবার শাসকবর্গ চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করতে কৃতসংকল্প হলেন।

প্রথম আঘাত ছিল 'যুগান্তর' পত্রিকাটির উপর। ১৯০৭, ৫ই জুলাই, এর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে তাঁর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৬ আগস্ট 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে গ্রেপ্তার হলেন অরবিন্দ। 'ভারতবর্ষীর জন্য ভারতবর্ষ' ('India for the Indians') এই শিরোনামে যে সম্পাদকীয়টি অরবিন্দ লিখেছিলেন তারই জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ এই রাজ-বিদ্রোহীকে অভিনন্দিত করে লিখেছিলেন 'নমস্কার' নামে একটি অবিস্মরণীয় কবিতা:

'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।'

সরকার পক্ষ থেকে এই মামলায় সাক্ষীরূপে ডাকা হয়েছিল বিপিনচন্দ্রকে। তিনি কিন্তু সাক্ষ্য দিলেন, উপরন্তু বললেন, তিনি এই আদালত মানেন না। বিচারে

তাঁর ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। আর তিনি সাক্ষ্য না দেওয়াতে মামলা টিকল না। অরবিন্দ সসম্মানে মুক্তিলাভ করলেন।

৩১ আগস্টে গ্রেপ্তার হলেন সন্ধ্যা সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁদের বিরুদ্ধে আনা হলো রাজদ্রোহের অভিযোগ একটি আপত্তিকর সম্পাদকীয় লেখার জন্য। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে এই মামলার বিচার আরম্ভ হয়। এই মামলায় উপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ যিনি পরবর্তীকালে দেশের কাজে সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশবন্ধু রূপে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। উপাধ্যায় নিজের কোন অপরাধ স্বীকার তো করলেনই না, উপরন্তু বললেন — বিদেশী শাসকের কাছে কোন কৈফিয়ৎ তিনি দেবেন না। মামলার চলবার সময়েই ১৯০৭, ২৭ অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে (এখন যার নাম নীলরতন সরকার হাসপাতাল) তাঁর মৃত্যু হয়।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হলো। সিডিশন আইন পাশ হলো। অত্যাচার ও বিপ্লব এবার মুখোমুখি দাঁড়ালো। মানিকতলার বাগানে বিপ্লবের ঘাঁটি স্থাপিত হলো। ফ্রেজার তখন পশ্চিমবঙ্গের ছোটলাট। তাঁর মাথার দাম অনেক। আরো একটি মাথা চিহ্নিত হয়েছিল; অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের মাথা। ইনিই তখন এক এক করে সমস্ত স্বদেশী সংবাদপত্রের সম্পাদকদের জেলে পুরবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। মেদিনীপুরে, নারায়ণগড় স্টেশনে ছোটলাটের সেলুন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় — বোমা ফেটেছিল, ডিনামাইটও ফেটেছিল, কিন্তু সেলুনটি অক্ষত ছিল।

সুরাটে কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞ দিয়ে শেষ হলো ১৯০৭ সাল। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে অরবিন্দও উপস্থিত ছিলেন। সুরাট থেকে অরবিন্দ বোম্বাই, পুনা, নাসিক ও অমরাবতীতে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা নয়, ওজস্বিনী ভাষায় অগ্নিস্রাবী মন্ত্রবাণী। প্রত্যেকটি বক্তৃতায় আছে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজমের নতুন ব্যাখ্যা, দেশপ্রেমের নতুন ভাষ্য। আর আছে স্বাধীনতা সংগ্রামে অকুণ্ঠচিত্তে যোগদানের জন্যে উদাত্ত আহ্বান। বোম্বাইতে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য।' বলেছিলেন: 'জাতীয়তা আদৌ শুধু নিছক একটা রাজনৈতিক প্রোগ্রাম মাত্র নয়। এ হলো একটা ধর্ম যা এসেছে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে।... এ ধ্বংস হবার নয়, একে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। জাতীয়তার মৃত্যু নেই।'

১৯০৮, ফেব্রুয়ারি। অরবিন্দ কলকাতায় ফিরলেন। ফিরে এসে দেশ ও জাতিকে তিনি বললেন: '১৯০৭ সালের মতো এই প্রকৃতি হবে হানাহানি।' রাজনীতির ঘূর্ণি কেন্দ্র চলেছে বাংলার বুকের উপর দিয়ে। এইবার নতুন হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠলো মানিকতলায়। বত্রিশ নম্বর মুরারিপুকুর [illegible] রোড। জায়গাটি জনমানবশূন্য জঙ্গলেই হয়। অরবিন্দের বাবা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ উত্তর কলকাতার এই জনবিরল স্থানে একটি বাগানবাড়ি কিনেছিলেন। এই নির্জন, পরিত্যক্ত বাগানবাড়িতেই বিপ্লবচর্চার আসর বসেছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবীদের দল। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, উল্লাসকর — প্রমুখ অনেক কৃতী সন্তান।

বত্রিশ নম্বর মুরারিপুকুর রোড। বাইরে থেকে দেখতে একটি সাধারণ বাড়ি, ভেতরে কিন্তু চৌখাটো একটি কারখানা। বোমা তৈরি হতো। প্যারিস থেকে বোমা তৈরি করার পদ্ধতিটা আয়ত্ত করে সদ্য ফিরেছেন হেমচন্দ্র — মেদিনীপুরের বীর সন্তান হেমচন্দ্র কানুনগো। টেবিলের উপর লেবেল-আঁটা কয়েকটি বোতল। বোতলের গায়ে লেখা সালফিউরিক এসিড, পিকরিক এসিড। একটি [সুশীল] কিশোর এক মনে সাহায্য করছে হেমচন্দ্রকে। টেবিলের একধারে রয়েছে বোমা তৈরির অন্যান্য মালমশলা। সেগুলি তিনি যত্নের সাথে পরীক্ষা করছেন।

কাজ হচ্ছে নিঃশব্দে।

কাজ হচ্ছে সন্তর্পণে। [একটি মানুষের ওপর নজর রেখে]

সকাল সন্ধ্যে বেলা বারান্দায় গীতা পড়ছেন। ছেলেরা শুনছে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ — ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ — কানে কানে বেজে যায়। শত্রুকে নির্মূল করে বীরের যা প্রাপ্য গৌরব, এই বিজিত ভূমি ভোগ কর — কী সুন্দর কথা! ভেতরে বোমা তৈরি হচ্ছে, বাইরে চলছে গীতাপাঠ। প্রত্যেককে এক একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হেমচন্দ্রের কাজ ছিল বোমা তৈরি করা, বারীন্দ্রের কাজ ছিল ছেলে সংগ্রহ করা। সারা বাংলা ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন কয়েকটি দুঃসাহসী কিশোর ও ছেলে। সেই সঙ্গে টাকাও সংগ্রহ করতে হতো তাঁকে। কিছু বিস্ফোরক জিনিসও মজুত করা হয়েছিল এই বাগান বাড়িতে। এখানে থাকতো বিপ্লবী-কিশোরদের অস্ত্রাগার।

।। তিন ।।

অবশেষে একদিন বিস্ফোরণ ঘটলো চন্দননগরে।

১৯০৮, ১১ এপ্রিল। মঁসিয়ে তার্দিভেল তখনকার মেয়র ছিলেন। তিনি স্থানীয় শাসনকে অপব্যবহৃত করে চন্দননগর থেকে স্বদেশী প্রচার বন্ধ করতে মনস্থ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাকালে যেহেতু ব্রিটিশ ভারতের বাইরে এই ফরাসী উপনিবেশটি তখন হয়ে উঠেছিল স্বদেশী প্রচারের একটি কেন্দ্র এবং অগ্নিযুগের বাংলায় বিপ্লবের একটি পীঠস্থান। কানাইলাল দত্ত এখানকারই সন্তান। চন্দননগরের বিপ্লবী সমিতি থেকে তিনি মানিকতলার দলে যোগদান করেছিলেন।

স্থানীয় তরুণদের মন তার্দিভেলের উপর তিক্ত হয়ে উঠলো। তাঁরা ঠিক করলেন — অত্যাচারী মঁসিয়ে তার্দিভেলকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত করতে হবে। তারপর ১১ এপ্রিল তার্দিভেল যখন তাঁর বাংলোতে নৈশভোজে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সেখানে একটি অতর্কিতে বোমা ফেলা হয়। কিন্তু সে-বোমা ফাটলো না। মেয়র প্রাণে বাঁচলেন। সারা শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। তিনি তল্পি-তল্পা বেঁধে ফরাসীদেশে চলে গেলেন।

এর পরেই আল-কৈশোরের উদ্দাম ঝড় নিয়ে দেখা দিল সন্ত্রাসবাদ। নবযুবকেরা নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে আসে তাদের লক্ষ্যসাধনের পথে। বিপ্লব-যজ্ঞে প্রাণ আহুতি প্রদানের জন্য তারা প্রস্তুত হয়। ঠিক হলো প্রথমে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তাঁর অত্যাচারের মাত্রা তখন সকলের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে

বেতের প্রতি ঘায়ের সঙ্গে সুশীল আরো জোরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে থাকে। সেই দৃশ্য দেখে দেশের লোক গাইল — বেত মেরে কি মা ভোলাবে আমি কি মায়ের সেই ছেলে।

গেছে। মন্মথ প্রভৃতি কলকাতার রাজদ্রোহের মামলায় তিনি অনেককে শাস্তি দিয়েছেন। আদালতের মধ্যে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করার জন্য চৌদ্দ বছর বয়সের বালক সুশীল সেনকে চৌদ্দ ঘা বেত মারবার হুকুম তিনিই দিয়েছিলেন। এই সুশীলও মানিকতলার মামলায় যোগদান করেছিল।

কিংসফোর্ডকে মারবার প্রথম চেষ্টা এল অলৌকিক 'বই-বোমা' (Book-bomb) দিয়ে। সি.আই.ডি. রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে: 'একটি হুইলারের বইয়ের মাঝখানে পাতা কেটে ফেলে জায়গা করে একটি বোমা এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, বইটি খুলতে গেলেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কিংসফোর্ডের হাতে [illegible] বোমাসমেত বইটি দেওয়া হয়। বইটি তিনি না খুলেই আলমারীতে রেখে দেন।'

বোমা ফাটল না, কিন্তু কিংসফোর্ড আর কলকাতায় থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। মৃত্যুকে এড়িয়ে তিনি বদলি হয়ে চলে গেলেন মজঃফরপুরে। বিপ্লবীদের হাত তখন প্রসারিত হলো মজঃফরপুর পর্যন্ত। কিন্তু এই দুঃসাহসিক কাজের ভার নেবে কে? এগিয়ে আসে কিশোর ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। [illegible] বাগান বাড়ির ভেতরে একটি গোপন মন্দির-কক্ষে নিয়ে এলেন [illegible] দেব জননী, ভিখারিনী, কাপালিনী খড়্গধারিণী ভয়ঙ্করা মায়ের জননীর রূপে। সেই কালীমূর্তির

সামনে নতজানু হয়ে শপথ নিলো ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল— হয় কার্যসিদ্ধি, না হয় মৃত্যু। কবীন্দ্র একটি ছোট হ্যান্ডব্যাগ প্রফুল্লর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে আছে। যাও, সংকল্প সিদ্ধ করে ফিরে এসো। অন্যথায় রিভলবার দিয়ে নিজের হাতে নিজের প্রাণ নিও।"

১৯০৮। মে মাসের প্রথম দিন।

বৈশাখের উজ্জ্বল প্রভাতে উজ্জ্বল কালির অক্ষরে মজঃফরপুরে বোমা ফাটার সংবাদ সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হলো। ৩০ এপ্রিল। রাত্রিকাল। রাস্তার ধারে ছায়া নিবিড় একটি গাছের অন্তরালে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম। অদূরে একটা ফিটনের শব্দ শোনা গেল। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের ফিটন বলে হয়। দুজনেই প্রস্তুত হয়। দুজনেই পকেট থেকে হাত বোমা বের করে নিলেন। ঘন্টি বাজতে বাজতে ফিটনটি তাদের সামনে এসে পড়লো। তখন দু'দিক থেকে অন্ধকারে গাড়িটিকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয় মৃত্যুবাণ— হেমচন্দ্রের হাতে তৈরি শক্ত বোমা। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হয় রাত্রির অন্ধকার। দুজন দুদিকে ছুটে পালায়। ফিটনটি আগুনে ধরে গেল। কিন্তু এমনই ভাগ্যের ফের, কিংসফোর্ড মরলেন না— মরলেন মিসেস কেনেডি ও তাঁর মেয়ে।

প্রমবৃত্ত ভাগ্যক্রমে কিংসফোর্ড বেঁচে গেলেন। অদৃষ্টের পরিহাস! মানিকতলার বিপ্লব প্রয়াস প্রথম পর্বেই অভিশপ্ত হলো; অসার্থক তো হলোই।

প্রফুল্ল ধরা পড়বার সময় নিজের হাতেই রিভলবার দিয়ে নিজের জীবন নষ্ট করেছিলেন। ক্ষুদিরামের চেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হয়। তিনি ধরা পড়েন।

আত্মবলি জাতির মর্মস্থলে স্পর্শ করলো। গ্রামের বাউল গেয়ে উঠলো — বিদায় দে মা ঘুরে / ফিরে আসি।

উনিশ বছরের কিশোর মজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন: 'আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। আমার বাবার নাম ৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু। বর্তমানে আমার বয়স ১৯। জেলা স্কুলের একজন ছাত্র। বাড়ি মেদিনীপুর জেলার হবিবপুরে। আমি মেদিনীপুর শহরে বাস করি; সেখানকারই আমি।' মজঃফরপুরের দায়রা জজের বিচারে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। হাইকোর্টে আপিল করেও কোন ফল হয়নি। ১৯০৮, ১১ আগস্ট, মজঃফর জেলে সকাল ছ'টায় এই কিশোরের ফাঁসি হয়। গণ্ডক নদীর তীরে, সেই কিশোর বিপ্লবীর চিতাগ্নিতে কি দেশের আকাশ সেদিন রাঙিয়ে উঠেছিল?

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম অগ্নিযুগের বাংলার প্রথম শহীদ যুগল। তাঁদের

#Space#

৩০ এপ্রিল মজঃফরপুরে বোমা ফাটলো। ২ মে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলেন। ঐদিন বাংলার সর্বত্র এবং বাংলার বাইরে দেওঘর পর্যন্ত পুলিশ বিরাট জাল ফেলেছিল। পাইকারি হারে হয়েছিল ধর-পাকড়। কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, কানাইলাল দত্ত, নিরাপদ রায়, বীরেন্দ্র গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও শৈলেন বসু; মানিকতলার বাগানে ধরা পড়েছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, পূর্ণচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র ঘোষ; মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এর কিছুদিন

পরে, দুই ব্যক্তির স্বীকারোক্তি ও মুরারিপুকুর বাগানে অন্য কাগজপত্র দেখে বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরেন গোঁসাই, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, সুধীর সরকার, হেমচন্দ্র সেন, সুশীল সেন ও বীরেন সেন। এর পরে গ্রেপ্তার হন প্রভাস চন্দ্র দেব, বিজয় মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালের স্বামী নিরালম্ব; ইনিই বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রবর্তক), ইন্দ্রনাথ নন্দী, দেবব্রত বসু, বিজয় ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর রায়-মৌলিক ও চন্দ্রকান্ত রায়। মুরারিপুকুর বাগানে পাওয়া গিয়েছিল বোমার খোল-ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি, রিভলবার, বন্দুক, রাইফেল, ডিনামাইট, বিস্ফোরক শিক্ষার কয়েকখানি বই আর প্রচুর [illegible] অস্ত্রশস্ত্র। হ্যারিসন রোডে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ পেয়েছিল কয়েক বাক্স বোমা, বিস্ফোরক তৈরির যন্ত্রপাতি ও মশলা।

এইভাবেই শুরু হয়েছিল আলিপুর বোমার মামলা। আলিপুরের দায়রা জজের এজলাসে এই মামলার শুনানী চলেছিল; সেইজন্য ইতিহাসে এই মামলা এই নামেই ~~[illegible]~~ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে এটাই ছিল সব চেয়ে চাঞ্চল্যকর ও বৃহত্তম রাজনৈতিক মামলা। এই মামলার প্রধান আসামী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, এবং আসামীদের সংখ্যা ছিল ছত্রিশ। আরো একটি কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এই মামলা — সে কৌঁসুলিরূপে প্রধান আসামীর পক্ষ সমর্থনে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাসের অপূর্ব সওয়াল। মামলা চলবার সময়, এক বিশ্বাসঘাতক প্রধান আসামীকে জড়িয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল।

অনুশীলন সমিতির পরিচালক ব্যারিস্টার পি. মিত্র এই মামলায় আসামীদের পক্ষ-সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন।

সেই বিশ্বাসঘাতকের নাম নরেন গোঁসাই। সে রাজসাক্ষী হয়েছিল এই প্রলোভনে যে, দণ্ড থেকে সে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক জানতনা যে, তার সহকর্মীদের হাতেই তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। তখন আলিপুর জেলের মধ্যেই বাংলার এই প্রথম বিশ্বাসঘাতকের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। বাংলার এই দ্বিতীয় মীরজাফরকে চরম শাস্তি দেবার দুঃসাহসিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন ধৃত আসামীদের মধ্যে দুজন তরুণ বিপ্লবী — কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁরাই সেদিন তাঁদের প্রাণ দিয়ে প্রবীণ আসামীর জীবনরক্ষা করেছিলেন — রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই প্রাণে মেরে মামলা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

১৯০৮। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন।

অরুণের তীক্ষ্ণ সূর্যকিরণ ভোরের বনে দেখা দিয়েছে।

এই দিনটি অগ্নিযুগের বাংলার ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা আছে। লেখা আছে: বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম বিশ্বাসঘাতক খতম করার প্রয়াস। বিপ্লবী শহীদদের হাতেই নিষ্পাদিত হয়েছে। জেলের মধ্যে নরেনকে গুলি করে হত্যা হয়েছিল সুপরিকল্পিত ভাবে। কিন্তু কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি হয়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে শহীদ কানাইলালের মৃতদেহ সৎকারের সময় এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল। কানাইলালের ফাঁসি হয় ১০ নভেম্বর। সত্যেনের ফাঁসি পরে হয়েছিল। বিপ্লবী বাংলার দ্বিতীয় শহীদযুগল এই দুজন। এখানে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লর মতো তাঁরাও কারাজীবনে সাহস সঞ্চার করেছিলেন।

৩৩

সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। যাঁকে যতীনের ব্যবস্থাপনায় আলিপুর পুলিশ কোর্টে গুলি করে হত্যা করেন চারু বোস ১৯০৯, ১০ ফেব্রুয়ারি

একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কানাইলালের ফাঁসির ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ ৯ নভেম্বর তারিখে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন পুলিশ ইনস্পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জি; ইনিই মোকামাঘাটে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি থেকেই সেদিন সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে, কলকাতায় বিপ্লব-সংস্থা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই ও সত্যেন — মৃত্যুঞ্জয়ী এই বিপ্লবী চতুষ্টয়কে বাঙালি কোনদিনই বিস্মৃত হবে না।

প্রায় এক বছর ধরে চলেছিল আলিপুর বোমার মামলা। সেই মামলার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এই মামলা চলবার সময় [illegible] এই স্মরণীয় মামলায় শেষের নয়দিন চিত্তরঞ্জনের সওয়াল স্বদেশে রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। সেই সওয়ালের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

N.P. দিন A

"আপনার সামনে আমি এইটুকু নিবেদন করছি যে, এরপরে যখন সকল কলরব থেমে যাবে, যখন স্তব্ধ হয়ে যাবে এইসব আন্দোলন ও কোলাহল, এই আসামীও যখন দেহত্যাগ করে পরলোকে চলে যাবেন, তারো পরে — বহুকাল পরে — দেশের লোক বলবে যে, ইনি ছিলেন দেশপ্রেমের এক অমর কবি, জাতীয়তাবাদের এক অগ্রদূত আর সমগ্র মানবজাতির নিঃস্বার্থ প্রেমিক। ইনি যখন এ পৃথিবীতে থাকবেন না, তখনো পর্যন্ত এঁর

চিত্তরঞ্জনের ভবিষ্যদ্বাণী মহাকালের বুকে মুদ্রিত হয়ে রইল। ক্ষুদিরাম, কানাই ও সত্যেনের ফাঁসী, প্রফুল্ল চাকির আত্মদান, আদালতে অরবিন্দের [illegible], চিত্তরঞ্জনের সওয়াল এইসব ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই প্রভাব কর্মীকে করে তুলেছিল নির্ভীক আর এর থেকেই পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী তাঁদের দুর্গম পথের যাত্রায় সংগ্রহ করেছিলেন, যতীন মুখার্জি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বাণী কেবল ভারতের মধ্যেই নয়, এদেশ ছাড়িয়েও দূর-দূরান্তের সাগর-পারে সকল দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হয়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হলো তাই আমি বলছি, এ ব্যক্তি আজ কেবলমাত্র এই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচার চাইছেন না — ইনি প্রথম এসে দাঁড়িয়েছেন ইতিহাসের মহা আদালতের কাঠগড়ার সামনে।

১৯০৯, ৬ মে। রায় বেরুলো।

হাকিমের অভিমত গ্রহণ করে, দায়রা জজ বীচক্রফট (ইনি কেম্ব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন এবং দুজনেই একসঙ্গে সিভিল সার্ভিস (I.C.S.) পরীক্ষা দিয়েছিলেন) আসামী অরবিন্দকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন এবং তিনি সসম্মানে মুক্তিলাভ করলেন। উল্লাসকর দণ্ডিত হন, বারোজনের [illegible] করেন। আরো একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই মামলা চলবার সময় কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও পুলিন দাস প্রমুখ বাংলার নয়জন নেতাকে রেগুলেশন আইনে নির্বাসিত করা হয়েছিল। কারামুক্তির পর বাংলার কর্মক্ষেত্রে অরবিন্দের অবস্থান কাল ছিল এক বছরেরও কম—মাত্র দশমাস। তারপর তিনি ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। ১৯১০ সালের মার্চমাসে বিপ্লব-মুখরিত বাংলা ছেড়ে, পণ্ডিচেরী চলে যান। তিনি বাংলায় আর ফেরেননি। কথিত আছে, যাওয়ার আগে বিপ্লবী দেশকর্মীদের উদ্দেশে একটি নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন: "এখন থেকে তোমরা যতীনকে অনুসরণ করে পথ চলো।" অতঃপর আমরা এই বিপ্লবী মহানায়কের জীবনচরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

॥ চার ॥

যে কয়েকজন তরুণ প্রথমদিকে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি বা বাঘাযতীন তাঁদের অন্যতম। কথিত আছে যতীন্দ্রনাথকে প্রথমবার দেখেই অরবিন্দ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'যতীন যেন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' — এই কথা তিনি বলেছিলেন তাঁর অনুজ বারীন্দ্রকুমারকে।

বিপ্লবের জয়টীকা ললাটে নিয়েই তাঁর জন্ম।

বিপ্লবনিষ্ঠা ছিল তাঁর সহজাত।

অগ্নিযুগের বাংলায় এই অগ্নিশিশুর একটি অনন্যসাধারণ স্থান আছে।

যতীন্দ্রনাথকে শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক চিন্তার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক বলতে পারি। কারণ তাঁরই অনন্যসাধারণ ত্যাগী জীবনে বাংলার বিপ্লববাদ একটি নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছিল এবং তাঁরই কর্ম ও চিন্তায় বাংলার বিপ্লব আন্দোলন ইতিহাস-সাহিত্যের সার্থকতা লাভ করেছিল। বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেবার প্রতিভা ও শক্তি তাঁর ছিল। শ্রীঅরবিন্দ দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর, বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন কিছু পরিমাণে স্তিমিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু বৈপ্লবিক বা সন্ত্রাসবাদমূলক কর্মধারা যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

তাঁর সম্বন্ধে স্মরণ করি শ্রীঅরবিন্দের সেই উক্তিটি। একবার পণ্ডিচেরী আশ্রমে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যদের বলেছিলেন: 'যতীনের কথা শুনেছ? লোকটি অদ্ভুত, আশ্চর্য মানুষ। পৃথিবীর যে কোনো দেশের মনুষ্য-সমাজের প্রথম সারিতে তাঁর আসন। সৌন্দর্য ও বীর্যবত্তার এমন সম্মিলন

কখনো কারো সঙ্গে দেখিনি। একজন যোদ্ধার মূল্যই ছিল তাঁর দৈহিক উচ্চতা।'

এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটি থেকে সেই অনুশীলনের বিপ্লবী মহানায়কের যে পরিচয় আমরা পাই, বাঘা যতীন সম্বন্ধে আমাদের মনে তা একটি সুস্পষ্ট ধারণা সহজেই অঙ্কিত করে দেয়। অগ্নিযুগের বাংলার দ্বিতীয় পর্বে বিপ্লবী সমাজে তাঁর যে একটি গৌরবময় স্থান ছিল সে বিষয়ে কোন দ্বিমত বা বিতর্কের অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁরই [illegible] শিষ্য ও সহকর্মী নরেন্দ্রনাথ রায়ের (পরবর্তীকালে যিনি এম. এন. রায় নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন) একটি অভিমত। তিনি লিখেছেন:

'আমরা তাঁকে মোটামুটি 'দাদা' বলেই ডাকতাম। দাদাদের দেশে ও দাদাদের কুলে তিনি ছিলেন অতুলনীয় — তাঁর মতো দ্বিতীয়টি আর কাউকে আমি দেখিনি।... আর সব দাদাদের দেখেছি অপরকে আদেশ করবার নিয়ম অভ্যাস করতে; একমাত্র যতীন মুখার্জি ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁকে কোনদিন এই নিয়ম অভ্যাস করতে হয়নি, ওটা ছিল তাঁর সহজাত। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়।... পরবর্তীকালে আমাদের সময়ের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হয়েছিল। এঁরা সকলেই ছিলেন ছোট আর বা বড়ো মানুষ; যতীনদা ছিলেন একজন প্রকৃত মহান বা মহৎ ব্যক্তি, এবং এখন পর্যন্ত তাঁর চেয়ে মহৎ ব্যক্তি আমি আর একজনকেও দেখিনি। উনি আদর্শের মানুষ হিসাবেই তাঁকে বুঝতে হবে।'

৯/২০০০

একটি অখণ্ড বীর্যবত্তার শুচিশুভ্র বিগ্রহমূর্তি বাঘা যতীন।
সেই মূর্তি আজ আমাদের স্মৃতিপটে ম্লান।

কিন্তু যখন আমরা এই মূর্তিকে ভারত তথা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমিকায় সংস্থাপিত করে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরীক্ষণ করি তখন কি দেখতে পাই। দেখতে পাই যে, মৃত্যুঞ্জয়ী এই বিপ্লবী বীর নায়ক ও তাঁর সহকর্মী চারজন বালেশ্বর যুদ্ধে আত্মদান করে, পরবর্তী কালের বিপ্লবীদের জন্য আত্মোৎসর্গের একটি নতুন আদর্শ রেখে গেলেন। বাঘা যতীনের চরিত্রের যা কিছু মহিমা, যা কিছু সৌন্দর্য তার সবটাই বালেশ্বরের বুড়ি-বালামের তীরে আত্মদানের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সেই আত্মদানের উজ্জ্বল বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে চিরকালের সম্পদ হয়ে আছে।

বিপ্লবী জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা সহজ নয়। ঘটনাবলীর অন্তরালেই অনুসন্ধান করতে হয় এঁদের জীবন। বিপ্লবী-মানসের গতি-প্রকৃতি যেমন বুঝতে হয়, তেমনি বুঝতে হয় তার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতিকে। বুঝতে হয় কোন উৎস থেকে তাঁরা তাঁদের জীবনের পথে আহরণ করেন সেই দুর্লভ বস্তু যাকে বলা হয় দেশপ্রেমের অগ্নিদীক্ষা। এঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে কাহিনী ও কিংবদন্তীর সৃষ্টি হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু তার মধ্যে বিপ্লবীজীবনের প্রতিফলন কতটুকু থাকে? আইসবার্গ (Iceberg) বা বরফের পাহাড়ের খুব সামান্য অংশই জলের উপর দৃশ্য-গোচর হয়ে থাকে, এর অধিকাংশই জলের তলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে যায়।

সমুদ্রের বুকে আলোড়ন একটি ঝড়ের তলদেশে প্রচণ্ডবেগে যখন আঘাত হানে তখনই তার অস্তিত্ব সম্যক ও অনেকেই উপলব্ধি করে থাকে। বিপ্লবীর জীবনও ঠিক সেই রকম।

আনন্দমঠের আদর্শটি নব-যুবকদের নতুন করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অরবিন্দ। বলেছিলেন — স্বদেশ সেবার জন্য কেবল বীরত্ব-দানই সব নয়। প্রথমে প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, আচার-অভিজ্ঞতায়, স্বাস্থ্য-কৌশলে, দেহে ও মনে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে। তারপর সেই মূল্যবান প্রাণ অপরের নির্ভীক দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে হবে। এই আদর্শকেই জাতির মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন একাধিক অমর আমাদের সাহিত্যের কবিতায় ও প্রবন্ধে রূপ দিয়েছিলেন। সেগুলি চিরকাল সম্পদ হয়ে আছে।

৪

~~"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে~~
~~নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।~~
~~মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে~~
~~তাহার আহ্বান-গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে,~~
~~সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,~~
~~নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন~~
~~শুনেছে সে সংগীতের মতো।"~~

যে অভীঃ মন্ত্র উচ্চারণ করে এই শতাব্দীর সূচনায় বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বিদায় নিয়েছিলেন, সেই মন্ত্র বাঙালী তরুণদের শুনিয়ে অরবিন্দ তাঁর

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় লিখেছিলেন: 'Courage is your principal asset. Heroism feels and never reasons and therefore is always right'. এই মন্ত্রে ভিন্ন দেশোদ্ধার মন্ত্র নয় – অরবিন্দের এই বাণী যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বিপ্লবীদের মনে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এই দুর্জয় সাহস অবলম্বন করেই তো বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে মাত্র চারজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজের সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন বাঘা যতীন।

আত্মত্যাগ আর আত্মঅনুভূতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বিপ্লবীর জীবন। তিনি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়েছিলেন; জীবনে তিনি গুরুরূপে বরণ করেছিলেন প্রখ্যাত মহাপুরুষ হরিদ্বারের বিখ্যাত ভোলানন্দ গিরি মহারাজকে। আবার তিনি সঙ্ঘজননী সারদা দেবীরও স্নেহ ও আশীর্বাদ দুই-ই লাভ করেছিলেন। ফলে এহেন বিপ্লবীর জীবনেতিহাস আলোচনা করতে হলে যতীনের ধর্মীয় প্রবণতা এবং তাঁর অন্তর্জীবনের উপর সম্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়। ইতিহাস যেমন কেবলমাত্র সন-তারিখের ফিরিস্তি নয় বা রাজা-মহারাজাদের কাহিনী নয়, অথবা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বিবরণমাত্র নয়, তেমনি প্রকৃত বিপ্লবীর জীবনও কয়েকটি ঘটনার সমষ্টিমাত্র নয়, তারচেয়ে অনেক কিছু বেশি। দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ ছিল বাঘা যতীনের জীবন।

Space

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত কয়াগ্রাম। এইখানে থাকতেন একটি শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার। তাঁদের উপাধি চট্টোপাধ্যায়। এই চাটুয্যেরা ছিলেন বাঘা যতীনের মাতুলবংশ। তাঁর বড়মামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কুষ্টিয়ার একজন সরকারী উকিল। কুষ্টিয়াতে তখনকার দিনে বসন্তকুমার ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি — সম্মানে ও প্রতিষ্ঠায়। বিত্তবান ও সঙ্গতিসম্পন্ন এই মানুষটি ছিলেন দানে মুক্তহস্ত। দরিদ্রের উপকার করতে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর এই মাতুলের অনেক সদ্গুণ ভাগিনেয় যতীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

মেজমামা হেমন্তকুমার L.M.S. পাশ-করা ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু তাঁর পসার ছিল যথেষ্ট এবং তিনি উপার্জন করতেন প্রচুর। ইনিও তাঁর অগ্রজের মতো ছিলেন পরোপকারী ও বদান্য প্রকৃতির মানুষ। হেমন্তবাবু থাকতেন কলকাতায় শোভাবাজারে। তাঁর ছিল মাত্র দুটি পুত্র, কিন্তু তাঁর সাহায্যে থেকে গ্রামের অনেকগুলি ছেলে, কেউ স্কুলে, কেউ বা কলেজে লেখাপড়া করত। বস্তুত কয়াগ্রামের গৌরবস্বরূপ ছিলেন এই মহাপ্রাণ [illegible] সন্তানদ্বয় — বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার। তাঁর শৈশব-জীবনে এই দুই মাতুলের জীবনাদর্শ থেকে ভাগিনেয় যতীন্দ্রনাথ যে চরিত্র-গঠনের বহুবিধ উপাদান পেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'আমার বড়মামা ও মেজমামার মতো মানুষ হয় না — দুজনেই দেবতুল্য মানুষ' — এই কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় যতীনের মুখে প্রায়ই শোনা যেত।

এই অখ্যাত গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৭৯, ৮ ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন যতীন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান ও একমাত্র পুত্র। এঁদের প্রথম সন্তানটি কন্যা — নাম বিনোদবালা; ইনিই ছিলেন বাঘা যতীনের অগ্রজা। মুখুয্যেরা ছিলেন যশোহরের অধিবাসী। প্রতাপাদিত্যের যশোহর। এই জেলার অন্যতম মহকুমা ঝিনাইদহ। এই ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডু থানার অন্তর্গত রিশখালি গ্রামে এঁরা বাস করতেন। যতীনের পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ব্রহ্মোত্তর ভোগী একজন ব্রাহ্মণ। তেজস্বী প্রকৃতির মানুষ। পিতার তেজস্বী সত্তাকে অনেকটাই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন পুত্র যতীন্দ্রনাথ।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন যশোহরের বহু স্থানে নীলের চাষ হত। নীলকুঠির সাহেবদের কী দোর্দণ্ড প্রতাপই না ছিল। সবাই তাদের ভয়ে তটস্থ থাকত। এই নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের ফলেই বাংলায় প্রথম গণ-বিদ্রোহ — নীলকর আন্দোলন হয়েছিল। [illegible] এই আন্দোলনের সঙ্গে চিরকালের মত বিজড়িত হয়ে আছে তিনজন সমসাময়িক বাঙালি সন্তানের নাম — হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এঁদের সঙ্গে আরো একজনের নাম করতে হয়। তিনি পাদ্রী লং সাহেব।

হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী। দীনবন্ধু মিত্র সেই কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন একটি চিত্রময়ী নাটক — 'নীল দর্পণ' আর মাইকেল ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন যুগান্তকারী এই নাটক। সেইটা প্রকাশ করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন পাদ্রী লং সাহেব। কুঠিয়াল সাহেবরা ক্ষিপ্ত হয়ে দুটি মামলা করেছিল হরিশ্চন্দ্র ও লংসাহেবের বিরুদ্ধে। মূল নাটকে নাট্যকারের নামের উল্লেখ ছিল না বলে সাহেবরা দীনবন্ধুকে আদালতে অভিযুক্ত করতে পারেনি। মামলা চলার সময় হরিশ্চন্দ্র মারা যান আর লং সাহেবের জেল হয়। এই বিচারকে স্মরণীয় করার জন্য ছড়া বাঁধা হয়েছিল:

'নীল বানরে দেশটাকে করলো ছারখার।
হরিশ মলো অকালে, লঙ-এর হলো কারাগার।'

নীল-বিদ্রোহের ইতিহাসটা একটু বলা দরকার। কারণ এর মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল পরবর্তীকালের জাতীয় অভ্যুত্থান বা সিপাহী বিদ্রোহ যেটা দু'বছর বাদে ঘটেছিল। তারও সূচনা হয়েছিল বাংলাতেই।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশ থেকে যেসব পণ্যদ্রব্য তাদের দেশে রপ্তানি করতো সেগুলির মধ্যে নীল ছিল একটা। বাংলায় এই নীলচাষের একচেটিয়া অধিকার ছিল কোম্পানির। তারপর কোম্পানি যখন নীল চাষ করা থেকে বিরত হলো, তখন অনেক ব্যবসায়ী ইংরেজ

নীল চাষে মন দেয়। এদেরকেই বলা হতো নীলকুঠির সাহেব, নীলকর সাহেব বা কুঠিয়াল সাহেব। খুব লাভের ব্যবসা ছিল এটা। তাই নীলকর সাহেবেরা বেশি পরিমাণে নীল উৎপাদনের জন্য চাষীদের ওপর চালাতো অকথ্য অত্যাচার। কুঠিয়াল সাহেবদের ভয় করতো সবাই — দারোগা, পুলিশ, জমিদার, তালুকদার, চাষী — সকলেই। এদের কাছে জুলুম করে, জোর করে নীলের চাষ করানো হতো। কেউ আপত্তি করলে চলতো না। তখন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হয় বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভ ক্রমে রূপান্তরিত হয় তীব্র আন্দোলনে। ইতিহাসে এরই নাম নীল-বিদ্রোহ বা নীলচাষীদের আন্দোলন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ চাষী সেদিন একযোগে নীলচাষের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেছিল। ফলে নীলের চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নীল-বিদ্রোহই ইংরেজ আমলের ভারতে প্রথম সার্থক গণ-আন্দোলন। পরবর্তীকালের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনগুলির ওপর এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বাংলায় নদীয়া-যশোহর-খুলনা অঞ্চলে নীলের চাষ হতো। এইসব অঞ্চলে বহু কুঠি ছিল। এমনি একটি কুঠি ছিল উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গ্রামের নবগঙ্গার [?] তীরে মিদরে [?] নামক স্থানে। এই কুঠির লেরিচ সাহেবকে ঝিনাইদহ মহকুমার সকলে ভয় করতো। সাহেব যখন ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে যেতেন, যে কেউ তাঁর সামনে পড়ত, তাকে মাথা নীচু করে সাহেবকে অভিবাদন করতে হতো। শুধু মাথা

নীচু করতেন না সাহেবের কাছে এই মুখুয্যে মশাইরা। সে-যুগে প্রবল-প্রতাপান্বিত দুর্ধর্ষ নীল-কুঠিয়াল সাহেবের কাছে যে মাথা নত হয়নি, সে-মাথা যে কতখানি উঁচু ছিল আর সেই মানুষটির মেরুদণ্ড যে কি রকম ঋজু ও শক্ত ছিল, আজকের দিনে তার যথার্থ সীমা কষা কঠিন।

পিতার এই তেজ পুত্র যতীন্দ্রনাথের মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই দেখা গিয়েছিল। তাঁরও মাথা ও মেরুদণ্ড প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ রাজশক্তি ভাঙতে বা নোয়াতে পারেনি। সেইজন্যই বোধ হয় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন: 'যতীন একটি আশ্চর্য মানুষ। শক্তিতে, সাহসে ও বীর্যবত্তায় তিনি ছিলেন সত্যিই অতুলনীয়।' যতীন্দ্রনাথ খুব অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন। তখন তাঁর বিধবা মা শরৎশশী দেবী নাবালিকা কন্যা ও নাবালক পুত্রকে নিয়ে বিপদে পড়লেন। যথার্থ উন্নত আদর্শের হিন্দু নারীর প্রতিমূর্তি ছিলেন শরৎশশী দেবী। স্বাভাবিক কবিত্ব-প্রতিভার সঙ্গে আরো অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। স্বামী ছিলেন ব্রহ্মোত্তরভোগী ব্রাহ্মণ; সম্বল বলতে তাঁদের কিছুই ছিল না। বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার, দুজনেই তাঁদের এই ভগ্নীটিকে খুব স্নেহ করতেন। বোনের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় কেউই তাঁরা স্থির থাকতে পারলেন না। ভগ্নী ও ভাগ্নে দুটিকে মানুষ করার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করলেন। তাদের নিয়ে বোনকে কয়াগ্রামে চলে আসতে বললেন তাঁরা। উমেশচন্দ্রের মৃত্যুকালে যতীনের বয়স ছিল মাত্র [illegible]

॥ পাঁচ ॥

শরৎশশী গেলেন দাদাদের আশ্রয়।

নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

ছেলে দুটির মুখের দিকে তাকিয়ে বুক বাঁধলেন সহায়-সম্বলহীনা বিধবা। তাঁর সম্মুখে রয়েছে মরুভূমির মতো বিস্তৃত জীবন। সেই জীবনের কর্ণধার হয়ে স্বামীর শোক ভুলে ছেলে দুটিকে মানুষ করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। শরৎশশী এসে আশ্রিতা হলেন তাঁর দাদাদের সংসারে। সেখানে তাঁর এবং তাঁর পুত্রকন্যা দুটির আদর-যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হলো না। অতঃপর সংসারের সকলে দায়িত্ব বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার ন্যস্ত করলেন তাঁদের শিক্ষা দীক্ষা দেখাশোনার ভার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, উত্তরকালে যে দুর্জয় সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের জন্য যতীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ-পরবর্তী কালে, বাংলার বিপ্লবী সমাজে নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই। যে বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সেই সুপ্রাচীন বংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই প্রবল বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। আর যে নৈতিক শক্তি প্রকাশ এই বিপ্লবী বীরের চরিত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি তার অনেকটাই তাঁর মধ্যে কিশোর বয়সেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর পিতা-মাতা এবং আদর্শ-চরিত্র মাতুল দুইজনের কাছ থেকে। বংশগরিমা না থাকলে কেউ কখনো

বড়ো হয় না। পারিবারিক ঐতিহ্য আর উন্নত পারিপার্শ্বিক – দুইই মিলে গঠিত হয় চরিত্রের বনিয়াদ। এদিক দিয়ে আমাদের এই আলোচনার নায়ক যতীন্দ্রনাথ যে সৌভাগ্যবান ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যতীন্দ্রনাথের জন্মকালের পরিবেশটা কিরকম ছিল, সেটাও আমাদের একটু জানা দরকার। তাঁর জন্মকাল সন্ধিক্ষণ। বাংলার নবজাগরণের তখন পূর্ণ পরিণত অবস্থা। সাহিত্যের সকল দিক – কাব্য, নাটক ও উপন্যাসে বেশ অনেকখানি পরিণতি লাভ করেছে। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও জাগ্রত হতে আরম্ভ করেছে। সমাজ-জীবনে একের পর এক দেখা দিয়েছে ভাব-বিপ্লব। বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ তখন বাঙালির জনজীবনের উপর বিস্তার করেছেন অপ্রতিহত প্রভাব। একা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথই তখন রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে একটি নূতন মানস-মণ্ডল রচিত হয়ে চলেছিল। তাঁরই হাতে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি রাজনৈতিক দীক্ষা লাভ করেছিল। তার আগে দেখা দিয়েছে বিদ্যাসাগরের সমাজ-বিপ্লব, যার ফলে উদার মানসিকতার পথে বাঙালি অনেকখানি অগ্রসর হতে পেরেছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ – এবং কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ধর্মজগতে সংস্কারের এক প্রবল বন্যা। আর এর সঙ্গে

গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরে এক অর্ধশিক্ষিত সাত্ত্বিক আপন মনে করে চলেছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের সাধনা এবং তারপর বেদান্তের উদার বাণীকে যিনি বিশ্বব্যাপী করে তুলবেন সেই বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ তখন [illegible] সবেমাত্র দক্ষিণেশ্বরে আসতে আরম্ভ করেছেন।

এই ছিল সেই মহান বাংলার বর্ণাঢ্য পারিপার্শ্বিক।

এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভাবীকালের বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি। শ্রী অরবিন্দ-কথিত আশ্চর্য মানুষ বাঘা যতীন। শহর কলকাতা থেকে বহু দূরে গড়াই নদীর তীরে এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। সেই গড়াই নদীর তীরেই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবন। এই নিভৃত পরিবেশ থেকেই এই শিশু যে তাঁর প্রাণশক্তি আহরণ করে, নিয়তি-নির্দিষ্ট এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক [illegible] ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন সেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নীতিকৌশলেরই কার্যক্রমের এই শিশুটি, যশোহর জেলার যুবসম্প্রদায়ের বন্ধু, যতীন্দ্রনাথ আত্মবলিদান করেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। সত্যিই তিনি এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন।

space

শরৎশশী খুব অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন।

ভাগ্যের ওপর কারো হাত নেই, তাই ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর বিধান তিনি মাথা পেতেই নিয়েছিলেন। স্বামীর অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারটা যেন তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে গেল — শূন্য ও অর্থহীন হয়ে গেল, বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে আর ভবিষ্যতের সকল আশা। শুধু সন্তান দুটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে জীবনধারণ করতে হচ্ছে তখন থেকে। তার উপর এই বিধবা নারী ছিলেন একেবারেই নিঃসম্বল। স্বামীর বংশের বাতি — শিবরাত্রির সলতে এই যতীন — তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান।

এই ছেলেকে মানুষ করতে পারলে আবার যদি বিধির কৃপায় সুখের দিন ফিরে আসে। তাই শরৎশশী তাঁর মাতৃহৃদয়ের সকল স্নেহ, সকল ভালবাসা দিয়ে ছেলেটিকে ঘিরে রাখতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে উমেশচন্দ্র তাঁর সহধর্মিনীকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, মুখুজ্যে বংশের ইতিহাসটা তো জানো বড়বৌ, আর তোমাদের বংশগৌরবের কথাও কিছু জানো। এই দুই বংশের পূর্বপুরুষদের বহু গুণের ধারা তোমার এই ছেলে। আমি যতির ঠিকুজি বিচার করিয়েছি, দেখেছি যে এক ক্ষণজন্মা পুরুষ এসেছে আমাদের সংসারে। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মুখই শুধু সে উজ্জ্বল করবে না, সেইসঙ্গে দেশেরও মুখ উজ্জ্বল করবে সে। পণ্ডিত রামদীন আচার্যের গণনা কখনো নিষ্ফল হয় না।

একদিন দুপুরবেলায় তাঁর ঘরটিতে বসে, অতীত দিনের এইসব কথা

গেরছিলেন শরৎশশী। এখন তিনি ছেলে মেয়ে দুটিকে নিয়ে তাঁর দাদাদের
সংসারে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্রয় ঠিক বলা চলে না, কেননা তাঁর অগ্রজ
এঁরা দুজনেই তাঁদের, মহেন্দ্রনাথকে অসীম স্নেহের চক্ষে দেখতেন। যতীন
এখনো ছেলেমানুষ। তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা আপাতত কয়াগ্রামেই করা
হয়েছে — গ্রামের পাঠশালাতেই ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। দাদা
বলেছেন, একটু বড়ো হলেই যতিকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাবেন ও সেখানকার
বড়ো স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

কয়াগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ [সুন্দর] অতি। পদ্মা-তীরবর্তী
সেই শান্ত ছোট্ট গ্রামটির মনোরম পরিবেশেই অভিসিঞ্চিত হয়েছিল বাঘা
যতীনের শিশুমানস। গ্রামের পেছনে মাইল তিনেক দূরে পদ্মা; তারই
শাখানদী গড়াই গ্রামের সম্মুখভাগ দিয়ে বয়ে চলেছে। বর্ষাকালে এই
গড়াই দেখতে হয় ভীষণা, ভয়ঙ্করী মূর্তি। তখন গ্রামের নর-নারীদের
দলবদ্ধ হয়ে নদীর ঘাটে ঘাটে স্নান করতে হবে, কারণ কুমীরের ভয়ে
কেউ যদি কেউ একা জলে নামতে সাহস পেতনা। এমনকি তখন, একা নদীর তীরে
দাঁড়াত, তার সর্বনাশ হবে নদীর ভয়াল মূর্তি দেখে। বর্ষাকালে নদীতে
কেউ বড়-একটা একলা স্নান করতে আসতেন না কুমীরের ভয়ে। কিন্তু
শরৎশশীর ভয় ছিল না। বর্ষার দিনেও তিনি প্রতিদিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে
স্নান করতে আসতেন। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করতেন আর সাঁতার কাটা
শেখাতেন ছেলেকে।

প্রসঙ্গ : ছিলেন বাঘা যতীনের মা।

বর্ষায় স্ফীত মাতাল নদীর বুকে প্রবল তরঙ্গ আর আবর্ত, সেই অসীম জলরাশি প্রবাহিত হয়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে; পদ্মার মতোই এই নদী বর্ষাকালে ভীষণ রূপ ধারণ করে, কুমীর ও হাঙরে পূর্ণ থাকে। সেই তরঙ্গসঙ্কুল মাতাল নদীতে নিঃশঙ্কচিত্তে সাঁতার কাটা শেখাচ্ছেন তাঁর একমাত্র সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে এক বিধবা জননী — এই দৃশ্য কল্পনা করলেও আমাদের মন আতঙ্কে শিউরে ওঠে, শরীরে জাগে রোমাঞ্চ। এ যেন নিজের হাতে নিজের ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। বাংলায় তখন এমন মা কয়জন ছিলেন জানিনা, তবে শরৎশশীর মতো এমন নিঃশঙ্কচিত্ত জননীর সংখ্যা যে খুব বেশি ছিল না, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। ভবিষ্যতে যাঁকে আমরা দেখব 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' এই মূর্তিতে, যিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেন, সেই যতীন্দ্রনাথের শৈশবজীবনের এই চিত্রটি কি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সুন্দরভাবেই সঙ্গতি বজায় রাখে না?

যখন কেউ শরৎশশীকে বলতো, ওঁর প্রাণে কি একটুকু ভয় নেই যে এইটুকু ছেলেকে তিনি নদীর বুকে ঠেলে দিচ্ছেন, তখন শরৎশশী কি উত্তর দিতেন সেটা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি: (ভগবানই তো সম্বল), ও ছেলে একদিন পদ্মা-মেঘনা সাঁতরে পার হবে।' বাঘাযতীনের মায়ের উপযুক্ত কথা বটে — নইলে (এমন) নির্ভীকতার নিদর্শন কোন্ নারী দেখাতে

পেয়েছেন? সত্যিই উত্তরকালে ইংরেজ রাজশক্তির অন্তরে, যিনি মহাত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন, বিপ্লবকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই চির নির্ভীক বিপ্লবী নায়ক যে একজন আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? শৈশবে দুরন্ত গড়াই নদীর তরঙ্গ-সঙ্কুল বুকে সাঁতার শেখা থেকে শুরু করে বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে টেগার্ট-লোম্যানের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে আত্মবলি দেওয়ার দিনটি পর্যন্ত — এই বীর বিপ্লবীর জীবনের বাঁকে বাঁকে আছে সহস্র রকমের বিস্ময়কর উদ্ভাসন। যাঁর কণ্ঠে শুধু ধ্বনিত হতো 'রণং দেহি', যিনি অরবিন্দ চলে যাওয়ার পর বাংলায় বিপ্লবীদের অবসাদ ও দুর্দিনের অন্ধকারে আলো জ্বেলে রেখেছিলেন — কর্মশক্তি, নেতৃত্ব ও আত্মবিশ্বাসের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি যিনি ছিলেন, তাঁর জীবন কথা বাঙালির চিরকালের সম্পদ, এবং সর্বকালের প্রেরণা।

বাংলায় বিপ্লব-যজ্ঞ শুরু হওয়ার বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বড় নালিশ এই যে, তাঁহারা আমাদের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর সংকেত রাখিয়া যান নাই। সেকালে তাঁহারা মরিলেনই, কিন্তু মরার মতো মরিলেন না কেন? যদি কেবল একটা উদাহরণ তাঁহারা রাখিতেন, তবে আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিতাম।'

কবির এই আক্ষেপ [illegible] যতীনের জীবনে ব্যর্থ যে হয় নি, বরং সত্য

হয়েই দেখা দিয়েছিল — তিনি এবং তাঁর সঙ্গী চতুষ্টয় বুড়িবালামের তীরে বীরের মতোই মরেছেন। তাঁর এই অতুলনীয় দৃষ্টান্তের ফলেই তো পরবর্তীকালে সঙ্ঘগুলির বিপ্লব-সাধনা সহজ হয়। অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া মন্ত্রের সাধনে ভুললে না — এজন্য প্রয়োজন ইস্পাতের পেশী আর মনের অপরিমেয় বল। বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীরা শরীরচর্চার সাথে মানসিক উৎকর্ষসাধনেও প্রয়াসশীল ছিলেন। মনের যে বল থাকলে মানুষ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র টেনে ছিঁড়তে পারে, সেরকম তাঁদের প্রচুর ছিল, তেমনি সেই সঙ্গে ছিল নিয়মিত শরীরচর্চার ফলে অসাধারণ দৈহিক শক্তি।

বাঘা যতীনের মধ্যে আমরা এই দুটি জিনিসের সমাবেশই প্রত্যক্ষ করি। এমনকি, অসামরিক উচ্চ পদস্থ বহু ইংরেজ রাজকর্মচারী এই নির্ভীক বাঙালি তরুণের শক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেই শক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গিয়েছিল বালেশ্বরের যুদ্ধে। বালেশ্বরের ইতিহাস কি? উড়িষ্যার সমুদ্রকূলে বিদেশ থেকে আসবে আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাই করা একটি জাহাজ। সেই জাহাজ থেকে সেইসব অস্ত্র গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে যতীন্দ্রনাথ সদলে ও সংগোপনে উপস্থিত হন সেখানে। কোন একটা সূত্রে কলিকাতার পুলিশ সেই সংবাদ জানতে পেরে একটি সশস্ত্র বাহিনীসহ বিপ্লবীদের অনুসরণ করে। এই বাহিনীর সঙ্গেই মানুষ যতীন্দ্রনাথ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এই বীরত্ব, এই আত্মদানই এই বীর বিপ্লবীর জীবনের যথার্থ পরিচয়।

।। দুই ।।

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগুক সকল দেশ' — বাঘা যতীনের অল্পকালস্থায়ী জীবনটা যেন এরই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিল। পৃথিবীতে যাঁরাই বিধিনির্দিষ্ট হয়ে একটি গৌরবময় ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের বাল্যজীবনের আচার-আচরণ ও স্বভাবের মধ্যেই তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যতীন্দ্রনাথের শিশুজীবনেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। তাঁর এক [illegible] ও নির্ভরযোগ্য জীবনীলেখক শ্রী ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হলো:

'মাতুলালয়ে ছোট যতি দিন দিন বড় হয়ে উঠতে লাগলো। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার কচি মনের উপরে পড়তে লাগল পারিপার্শ্বিকের ছাপ আর প্রভাব। বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল জেলা বোর্ডের রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে সকাল বেলাতে কুষ্টিয়া থেকে আসতে ডাক-হরকরা। কাঁধে ডাক-ব্যাগ বহন করে, দক্ষিণ হস্তে একটি সড়কি নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হোত। তার সড়কির বাঁটে বাঁধা থাকত ঘুঙুর। দূর থেকে সেই ঘুঙুরের ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ শুনে যতি চঞ্চল হয়ে উঠত আর ছুটে বাইরে বেলগাছটির তলে গিয়ে দাঁড়াত। ডাক-হরকরা ঐ বেলগাছটির তলের তার ডাক-ব্যাগ নামাত; কপালের উপর থেকে তার বিস্রস্ত ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে ললাটের ঘর্ম মুছে ফেলত। যতি তখন, একেবারে কাছ ঘেঁষে বসে ডাক হরকরার সঙ্গে আলাপ করে নিত।'

কিশোরের মনে সহস্র কৌতূহল, অজস্র জিজ্ঞাসা।

কত দূর পথ অতিক্রম করে ডাক নিয়ে আসে অধ্যায়ে এই ডাক-হরকরা। দিগন্ত-জোড়া মাঠ অতিক্রম করে, নদীর স্রোত পেরিয়ে, শ্মশান ঘাটের পাশ দিয়ে তাকে আসতে হয়। শৈশবের মধ্যে থেকে কত শুনে ভূতের আর শ্মশানে কতো ভূত-প্রেতী। ডাক-হরকরার কি ভয় করে না? কত ভাবে কিশোরটি। একদিন সে ডাক-হরকরাকে আচমকা জিজ্ঞাসা করলো - যদি কোনদিন ভূত-প্রেত তোমাকে তাড়া করে, অথবা যখন সে রাতের সময়ে আসে, তখন কি হবে? শ্মশানে ভূত-প্রেতীতেও যে সন্ধ্যাবেলায় পথ আটকে দিতে পারে? তার ভয় করে না?

ভয়?

ডাক-হরকরা হেসে বলে, আর দশ বছর ধরে যে এই কাজ করে আসছে। ভয় করবে কেন? এই যে হাতে বর্শা রয়েছে - এই বলে সে তীক্ষ্ণ-শীর্ষ মোটা লোহার সড়কিটা ঝকঝকে দেখিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে বলে - এই সড়কি যতক্ষণ তার হাতে আছে, ততক্ষণ ভূত-প্রেত, কি হিংস্র বাঘ, কি শ্মশানের ভূত প্রেত বা দৈত্য দানো, কোন কিছুর জন্যেই তার ভয় নেই।

- তুমি ভূত বিশ্বাস করো? কিশোরের আচমকা প্রশ্ন।

- না দাদাবাবু। জবাব দেয় ডাকহরকরা।

- কেন?

- আমি তো কোনদিন দেখিনি; আর যা কখনো দেখিনি, তার জন্যে ভয় করব কেন?

— কিন্তু সবাই যে বলে বিন্দীপাড়ার ঘাটের শ্মশানে ভূত-প্রেত আছে, সন্ধ্যেবেলায় ওখানে গেলে তারা মানুষের ঘাড় মটকে দেয়।

— আমি ওসব কিছু বিশ্বাস করিনে দাদাবাবু। ওসব লোকের বানানো গল্প।

বালকের একটা কৌতূহলের নিরসন হলো।

ডাক-হরকরা যখন বলছে, তখন ভূত-প্রেত বলে নিশ্চয়ই কিছু নেই। তবু যতীন্দ্রনাথ নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। সেদিন পাঠশালের ছুটির পর বাড়িতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে সে তার মাকে বলে, মা, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমি একবার বিন্দীপাড়ার ঘাটে যাব।

— কি করতে যাবি? ওখানে তো শ্মশান।

— ঐ শ্মশানঘাটেই যাব— দেখব ভূত-প্রেত বলে সত্যি কিছু আছে কিনা।

— পারবি যেতে একলা? ভয় করবে না? কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যা।

— না, মা। আমি একলাই যাব। ভয় করবে কেন? তুমি আমার মাথা ছুঁয়ে দাও।

— কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবিনা সেখানে, এই বলে শরৎশশী দেবী ছেলের মাথায় তাঁর ডান হাতখানি রাখলেন কিছুক্ষণের জন্য। বর্ষাকালের দুরন্ত গড়াই নদীর জলে যাকে তিনি সাঁতার শিখিয়েছেন, সেই তাঁর ছেলে যাতে

অভিনিং হতে পারে, এই ছিল মায়ের অন্তরের নিভৃত কামনা। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। যতীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন বিন্দীপাড়ার ঘাটে। অদূরেই শ্মশান। চারদিক নির্জন। ক্রমে অন্ধকার ঘন হয়ে এলো। দু'একটা শেয়ালের বিকট চীৎকারে রাতের অন্ধকার নিবিড় হয়। ঘাটে মানুষ নেই। একটি আধপোড়া চিতার স্তিমিত আগুনের আলোয় শ্মশানের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ দিকটায় বট-পাকুড়ের নিবিড় বন। বালক অকুতোভয় চিত্তে সেই বনবীথি শ্মশানে ঘুরে বেড়ালেন। ভয় তো দূরের কথা, তাঁর গা কিছুমাত্র ছমছম করল না।

আর একটি ঘটনা।

গ্রামের মাঝে গড়াই নদীর উপরে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের গড়াই ব্রিজ। ব্রিজের উপর দিয়ে রেলগাড়ি ছুটে চলে যায়, বালকেরা বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। যতি মাঝে মাঝে অবাক বিস্ময়ে ভাবে — এই বিশাল অতল খরস্রোতা নদীর উপরে মানুষ কি করে এমন আশ্চর্য মজবুত ব্রিজ গড়ে তুলল! সে আত্মীয়, পিসীমা, সাথীদের জিজ্ঞাসা করে। তাঁর কাছে শুনল সেই বিস্ময়কর কাহিনী। সাহেবেরা এসে সেতু তৈরি করেছে, হাজার হাজার লোক লাগিয়ে। কখনো কাঁপতে হয়, আবার ভেঙে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবন লড়াই। স্রোতের ধাক্কায় যখন কাঁপুনি ধরতে আরম্ভ করে, তখন সাহেবেরা ভয়

পালিয়ে যায়। একবার মজুরেরা যখন এমনি করে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সাহেব রেগে গিয়ে যারা পালাচ্ছিল, তাদের গুলি করে মেরে ফেলল।

এমনি করে সাহেবরা নাকি পনর-কুড়িজন মজুরকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। অজয় নদীর উপর সেতু তৈরির এই ব্যাপারের কাহিনী কিশোর যতীনের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যায়। ডাকাতের দল যাদের বুকে রক্ত ঝরিয়েছিল, যাদের রক্তে অজয় নদীর তীরের মাটিতে মিশে আছে তারা কে? এই গ্রামেরই নির্দোষী গরীব লোক ছিল। বিনা দোষেই তাদেরকে এমনি করে নির্দয়ভাবে গুলি করে মেরে ফেললো সাহেবরা। এইসব কথা যতীন যতই চিন্তা করতে থাকেন, ততই তিনি যেন আক্রোশে ফুলে উঠতে থাকেন। সবার অলক্ষ্যে কিশোরের মনে জাগে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা। বড় হয়ে তিনি এর শোধ নেবেনই।

মাসীমা, আমি বড়ো হয়ে সাহেবদের মারব।

গল্পটা শোনার পর যতীন আচমকা এই কথা বলে উঠে। বড় মাসীমা পাশেই বসেছিলেন, শুনছিলেনও। বড় মাসীমা হেসে জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁরে যতি, সাহেবদের মারবি কেন?

ওরা কেন মজুরদের এভাবে গুলি করে মারল?

—ওরা রাজার জাত, দেশের শাসক, ওরা যা খুশি তাই করবে

পারে। এই কথা বললেন তাঁর বড় জেঠীমা। কিন্তু যতীনের মন কোনদিনই মানতে চায় না। বলেন — রাজার জাতই হোক অথবা দেশের শাসকই হোক, আমি এ অত্যাচারের শোধ নেবই নেব। বড়ো হয়ে আমি সাহেবদের মারব।

বালকের এই কথা বলতে বলতে [illegible] চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে ওঠে; মুখে চোখে ফুটে ওঠে এক আশ্চর্য জ্যোতি। ভবিষ্যকালের বিপ্লবী-নায়কের মূর্তি যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বালকের মুখে।

Space

ক্রমে কিশোরে উন্নীত হলেন যতীন্দ্রনাথ। তাঁর তখনকার চেহারাটা ছিল এই রকম: 'দেহে তার যৌবন বইতে শুরু হয়েছে। সুঠাম, বলিষ্ঠ, তেজোময় দেহ। পেশীগুলি বলিষ্ঠ সুপুষ্ট, আজানু [illegible] ঢেউতোলা ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত বক্ষ, সিংহ গ্রীবা; সর্বদেহে পৌরুষের দৃপ্ত ভঙ্গী, অপরূপ লাবণ্য এবং অজস্র শক্তির যেন গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। প্রশস্ত ললাটখানি ঢেকে প্রলম্বিত চাঁচর কেশ। দুটি উজ্জ্বল চক্ষু যেন রঞ্জিত হয়েছে অগ্নি-দীপ্তিতে। ছেলের দলের মধ্যে যতিকে দেখলে মনে হয় — যেন জ্যোতিষ্কদের মধ্যে উদয় হয়েছে এক বলিষ্ঠ [illegible] শিশু শার্দূল।'

যেন দক্ষ চিত্রকরের তুলিকাপাতে অঙ্কিত হবার যোগ্য পৌরুষের এই দুর্লভ ছবি। এ যেন মহাকাব্যের নায়ক। শুধুই কি সুগঠিত দেহ? সেই সঙ্গে কিশোর যতীনের মনটিও গড়ে উঠেছিল স্বতন্ত্রভাবে। দুঃসাহসের উজ্জ্বল দীপ্তি তাঁর ললাটে। চোখ দুটি দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে সেই অগ্নি তেজ যা

ছিল বাঘা যতীনের চরিত্রের একটি কমনীয় বৈশিষ্ট্য — যে তেজ দেখে সন্ত্রস্ত থাকতো ইংরেজ রাজপুরুষেরা আর যে তেজ অগ্নিযুগের বাংলাকে দিয়েছিল একটা নতুন ব্যঞ্জনা। তেজস্বিতার সঙ্গে মিশেছিল দুঃসাহস। কয়াগ্রামে তখন এমন অকুতোভয় ছেলে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। তাঁর দুঃসাহস অভিব্যক্ত হতো নানা ভাবে — বিশেষ করে সাঁতার কাটা আর ঘোড়ায় চড়ার মধ্য দিয়ে।

যতীন্দ্রনাথের বয়স যখন পনের বছর তখনকার একটি ফটো আছে। একটা সাদা ঘোড়ার পাশে লাগাম ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ৭ পরনে মাল কোঁচা-মারা ধুতি, অনাবৃত দেহ। সেই দেহের গঠন দেখে কেউ বলবে না যে, সেই কিশোরের বয়স মাত্র পনের বছর। এমন সুন্দর সুঠাম আর বলিষ্ঠ দেহী ছেলে বাঙালিদের মধ্যে সত্যিই দুর্লভ। ভগবান যাঁকে দিয়ে একটি মহৎ কার্য সাধন করবেন সেই অন্তর্যামী তিনি স্বয়ং যেন নিজের হাতে বুঝিনা নির্মাণ করেছিলেন — ভাস্কর যেমন খোদাই করে একটি মূর্তি। তাই মানবেন্দ্রনাথ রায় বলতেন: 'যতীনদার মধ্যে যেমন শক্তি ও সৌন্দর্যের সম্মেলন দেখেছি, তেমনটি আর দেখলাম না।' বাঙালিরা কখনো দেখেনি। ঘোড়ায় চড়তে খুব ভালবাসতেন যতীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে জেলা বোর্ডের সোজা দীর্ঘ সড়ক, কুষ্টিয়ার সদরপুর থেকে কুমারখালি পর্যন্ত। সেই সড়ক দিয়ে যতি ঘোড়া

চড়ে ছুটেছে। ঘোড়ার পিঠে জিন নেই, মুখে লাগাম নেই। অশ্বের নগ্ন পৃষ্ঠে বসে আছে যতি, বাঁ হাতে ঘোড়ার গ্রীবার ঝুঁটি চেপে ধরে ডান হাত আন্দোলিত করে ঘোড়াকে উৎসাহ দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়েছে সে, রাস্তা দিয়ে চলেছে যেন একটা ঘূর্ণী বায়ুর মতো ছুটেছে ধূলিরাশি, কোথায় বা ঘোড়ার সওয়ার কোথা কতে দৃষ্টি গোচর হয় না — এমনি তেই ঘোড়-দৌড়।

আর, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, আমাদের কল্পনায় যখন এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য আমরা দেখি, তখন মনে পড়ে প্রতাপ-শিবাজীর কথা আর দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের কথা। ইতিহাসে এঁরা সব বীর ছিলেন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। কিশোর শিবাজী যখন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নক্ষত্রবেগে মহারাষ্ট্রের পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়াতেন, তখন একদিন শিবাজী-জননী জিজাবাঈ এঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শিবু, তুমি এমন করে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াও কেন? উত্তরে কিশোর শিবাজী তাঁর মাকে বলেছিলেন, আমি মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধ করব মা, সেইজন্যেই তো এখন ঘোড়ায় চড়া শিখছি। তেমনি একদিন শরৎশশী দেবী তাঁর কিশোর পুত্রকে, হ্যাঁরে যতি, তুই এমন করে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াস কেন? আমরা অনুমান করতে পারি বাঘা যতীন কি উত্তর দিয়েছিলেন। হয়ত বলেছিলেন — আমি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করব বলে ঘোড়ায়চড়া শিখছি, মা।

— ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করবি কেন?

— ইংরেজ আমার দেশের শত্রু — ওরা পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধে রেখেছে আমাদের। এই বাঁধন আমি কাটতে চাই।

— পাগল ছেলে আমার। এসব চিন্তা তোর মাথায় কে দিল?

ভগবান।

— তুই ভগবান মানিস, যতি?

— খুব মানি মা। তুমিও তো মানো। তিনিই তো আমার অন্তরে দিয়েছেন এইসব চিন্তা, তিনিই তো দিয়েছেন আমাকে এই শক্তি আর সাহস।

space

ছেলেবেলা থেকেই খেলাধূলা, শিকার, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার-কাটা প্রভৃতি বিষয়ে যতীন্দ্রনাথের অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল। এ দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘোড়ায় চড়াটা শিখেছিলেন খুব ছোটবেলা থেকেই এবং সেই বালক বয়সেই দুরন্ত ঘোড়াদের তিনি বশে আনতে পারতেন। বড়ো হয়ে তিনি যখন কৃষ্ণনগরে এসে তাঁর বড়মামার বাসায় থেকে ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনা করতে থাকেন, তখনো তাঁর সেই ঘোড়ায় চড়ার আগ্রহ সমানভাবেই বজায় ছিল। হেমন্তকুমারের একটি চমৎকার আরবী ঘোড়া ছিল। এই জাতের ঘোড়াগুলো সাধারণত খুব তেজী হয়ে থাকে। কিন্তু সেই ঘোড়াকেও তিনি বশে এনেছিলেন। তাঁর মামার একটা বন্দুকও ছিল। সেই বন্দুক নিয়ে কিশোর যতীন প্রায়ই শিকার করতে

যেতেন। ঐ বয়সেই তাঁর বন্দুকের নিশানা ছিল নির্ভুল। আবার সাঁতারেও তাঁর জুড়ি ছিল না। গড়াই নদী সাঁতার দিয়ে এপার-ওপার হতেন, কখনো কখনো স্রোতে গা দিয়ে বহুদূর চলে যেতেন।

ভরা বর্ষার জল গড়াই নদী উত্তাল করেছে বিক্ষুব্ধ। পাঁচ-ছয় হাত উঁচু এক-একটা ঢেউ উঠছে আর সশব্দে যেন ফেটে গিয়ে বিপুল জলকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে — এর নাম মায়াবেড় ঢেউ। যতি স্নান করতে নেমে মাঝ-দরিয়ায় চলে গিয়ে জলের আনন্দে গা-ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতরিয়ে যেতে লাগল। নাগরদোলার মত যতি কখনো ঢেউয়ের তলায় ডুবে যাচ্ছে, কখনো বা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠছে। সাঁতার দিতে দিতে যতি কয়া থেকে সাত মাইল দূরে কুমারখালি উঠল।

এইভাবে ছেলেবেলা থেকে শরীরচর্চার দিকে ছিল বাঘা যতীনের অখণ্ড মনোযোগ। এজন্য তাঁর তপস্যা ছিল প্রচুর, এরই ফলে এক অসাধারণ বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী তিনি হতে পেরেছিলেন। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব বলেছিলেন, 'Mr. Jaten Mukerji had an exceptionally strong and fine physique.' টেগার্ট অতিরঞ্জন করবার মানুষ ছিলেন। কিন্তু কলেজে পড়বার সময় হঠাৎ তাঁর খুব অসুখ হয়। এতকাল পর্যন্ত বিশেষ কোন অসুখ-বিসুখ তাঁর হয়নি বললেই হয়। সেই জ্বরের আক্রমণে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে, ওঁর নিটোল বিনষ্ট হয়। অসুখ সেরে গেল, পথ্য পেলেন। কিন্তু শরীরের

সেই শক্তি যেন আর নেই। একদিন আয়নায় নিজের শীর্ণ শরীরটা দেখে তিনি যেন চমকে উঠলেন। যেমন করেই হোক ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করতে হবে। এই সময় তিনি কেবল চিন্তা করতেন কেমন করে আবার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। একদিন তাঁর কলেজের এক সহপাঠী তাঁকে বললেন, যতীন, তুমি অম্বুবাবুর আখড়ায় ভর্তি হও, সেখানে কুস্তী শেখ। কুস্তী করলেই স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। তিনি তাই করলেন। বিখ্যাত কুস্তিগীর অম্বু গুহের আখড়ায় ভর্তি হলেন ও নিয়মিত কুস্তী করতে থাকলেন। অল্পকালের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথ ফিরে পেলেন তাঁর সেই আগের নিটোল স্বাস্থ্য আর হয়ে উঠলেন একজন দক্ষ কুস্তিগীর।

চলবে।

যতীন্দ্রনাথ এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করলেন।

তাঁর বড়মামা তখন ভাগিনেয়কে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সহোদর ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। এই ছেলে যদি মানুষ হয় তবেই না তাঁদের বিধবা বোনের দুঃখ ঘুচবে। তাঁর ছোটমামা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন সেন্ট্রাল কলেজে। ছোটমামার [illegible] বাসায় থেকেই তিনি পড়াশুনা করতে থাকেন। যতীন ছোটমামার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যান। মামার তো মাত্র দুটি ছেলে, কিন্তু হেমন্তকুমারের ছেলেমেয়েদের [illegible] যেন ছেলেতে কিলবিল করছে; কারো কেউ স্কুলের ছাত্র, কেউ বা কলেজের। এ যেন [illegible]। কোনো ছেলে না খেয়ে আশেপাশের গ্রামের ছেলে বলে পরিচয় দিলেই হেমন্তকুমারের বাড়িতে তার স্থানলাভ সুনিশ্চিত ছিল।

শুধু কি খাওয়া? খাওয়া-পরা, স্কুল-কলেজের বেতন, সবই দেন ডাক্তারবাবু। এই সকল আশ্রিত ছেলেরা যা খায়, যা পরে, তাঁর নিজের ছেলে দুটিও তাই খায়, তাই পরে। শুধু কি ছাত্র? দেশের কত লোক কত দরকারে কলকাতায় আসেন আর তাঁরা এই বাড়িতেই তাঁদের প্রয়োজনমত বা ইচ্ছামত বাস করছেন, আহারাদি করছেন। এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আরো একটা ব্যাপার যতীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করত। মেজকাকার আপন-পর ভেদজ্ঞান নেই। দেশের লোকেরা শুধু যে তাঁর বাড়িতে এসে ওঠেন তা নয়, দরকার হলে তাঁরা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে টাকাও ধার নিতেন। কেউ শোধ দিতেন, কেউ দিতেন না, কিন্তু সেজন্য হেমেন্দ্রনাথের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। মেজকাকা মানুষ, না দেবতা? — সময় সময় ভেবেছেন তিনি।

— কাকা, তুমি এইভাবে দেশের লোককে টাকা ধার দাও কেন? — একদিন জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন যতীন।

— কি বলিস যতি? ওরা আমার দেশের লোক, ওদের প্রয়োজনের সময় ওরা যদি আমার কাছে হাত পাতে, তাহলে আমি কি না দিয়ে পারি। ভগবান আমাকে দিয়েছেন, আমি তাই পরের উপকার করি।

— কিন্তু আমি তো দেখি অনেকেই টাকা নিয়ে আর শোধ করেন না।

— তা না করুক। হয়ত পারেন না বলেই করেন না।

উত্তরকালে তাঁর দুই মেজমামা সম্পর্কে বলছেন, ডাক্তার মামা ছিলেন (দেবতুল্য) মানুষ, তাঁর অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। আমি তাঁকে যারপরনাই শ্রদ্ধা করতাম।

যতীন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র তাঁর তখনকার জীবনের অসীম সাহসিকতার একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আত্মীয় সুলেখক জীবনীকার শচীনন্দন বসু লিখেছেন:

"এন্ট্রান্স পাশ করে যতি কলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজে এফ. এ. পড়ছেন তখন। একবার ছুটির সময়ে সে কৃষ্ণনগরে বেড়াতে গেছে। বাজারের মধ্য দিয়ে যখন সে যাচ্ছে, চারিদিকে তখন হৈ-হৈ শব্দ। দোকানীরা তাড়াতাড়ি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে; পথচারী মানুষ ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।...রাজবাড়ির একটা বিরাট ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে বাঁধন ছিঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, আর উন্মত্ত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেই ক্ষিপ্ত অশ্বের ভয়ে সবাই রাস্তা থেকে পালাচ্ছে। যতি রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তার চারিদিক হতে শত শত লোকের সতর্ক অনুরোধ আসতে লাগল: পালাও, পালাও।

যতি পালাল না, দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার উপরে। পরক্ষণেই দেখা গেল — দূরে সেই বিকটাকার ক্ষিপ্ত তুরঙ্গম তীব্রগতিতে এইদিকে ছুটে আসছে। যতি তাড়াতাড়ি মালকোঁচা বেঁধে, শার্টের হাতার আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। দুরন্ত অশ্ব

দড়-বড় দড়-বড় শব্দে ঘোড়া নিকটে এসে পড়েছে, যতীন সহসা এক লম্ফে রাস্তার মাঝখানটিতে এসে দাঁড়িয়ে, দুই হাত প্রসারিত করে তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল। আকস্মিক সম্মুখে এইরূপ বাধা পেয়ে ঘোড়াটি থমকে দাঁড়াল। অমনি যতীন লাফিয়ে উঠে (বজ্রমুষ্টিতে) তার লাগামের মুঠি চেপে ধরল। ঘোড়া তখন পিছন-পা করে মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল আর তীব্র ক্রোধে চিঁ-হি-হি রবে গর্জন করতে লাগল।'

সেদিন এই দুরন্ত ঘোড়াকে যতীন্দ্রনাথ সেখানে থামিয়ে সেরে সকলের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলেন। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সরকারী উকিল বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের অদ্ভুত সাহস আর শক্তির কথা। অন্য আর একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এই রকম বীরত্ব আর সাহসের জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন প্রচুরভাবে — কৃষ্ণনগরের মহারাজা, জেলা শাসক এবং শহরের অন্যান্য ব্যক্তিরা একবাক্যে তাঁর এই সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ করেছিলেন।

এই সাহসিকতার ছবি উত্তরকালে বাঙালি আর সকলের প্রত্যক্ষ করেছিল বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে। সেদিন টেগার্টের মতো লোককেও স্বীকার করতে হয়েছিল: ভারতের সবচেয়ে সাহসী মানুষকে আজ দেখেছি। সেই মানুষটির নাম যতীন মুখার্জি।'

—